# তৃতীয় অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস

## শ্লোক ১

**সূত উবাচ**

**জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।**
**সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১ ॥**

**সূতঃ উবাচ**—সূত গোস্বামী বললেন; **জগৃহে**—গ্রহণ করে; **পৌরুষম্**—ভগবানের অংশ পুরুষ-অবতার; **রূপম্**—রূপ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহৎ-আদিভিঃ**—মহত্তত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা; **সম্ভূতম্**—সুনিষ্পন্ন; **ষোড়শ-কলম্**—ষোলটি মৌলিক তত্ত্ব; **আদৌ**—আদিতে; **লোক**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; **সিসৃক্ষয়া**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়।

## অনুবাদ

**শ্রীল সূত গোস্বামী বললেনঃ সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবান প্রথমে তাঁর পুরুষ-অবতারে বিরাট রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র আদি জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করেন। এইভাবে জড় জগৎকে সৃষ্টি করার জন্য তিনি প্রথমে ষোলটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন।**

## তাৎপর্য

*ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পূর্ণাংশ বিস্তার করে এই জড় জগতের প্রতিপালন করেন। এই পুরুষাবতার সেই তত্ত্বকেই বিশ্লেষণ করে। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বসুদেবের পুত্র অথবা নন্দ মহারাজের পুত্র বলে প্রসিদ্ধ, তিনি সর্ব ঐশ্বর্যে পূর্ণ—সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র বীর্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁর ঐশ্বর্যের একটি অংশ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত, এবং অপর একটি অংশ পরমাত্মারূপে প্রকাশিত। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পুরুষ রূপ হচ্ছে আদি পরমাত্মা। জড় সৃষ্টিতে তিনটি পুরুষ রূপ রয়েছে, যাঁরা কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামে পরিচিত। তাঁদের সম্বন্ধে আমরা একে একে অবগত

হব। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর রোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবিষ্ট হন।

*ভগবদ্গীতাতে* আরও বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই জড় জগতের সৃষ্টি হয় এবং তারপর তা আবার ধ্বংস হয়ে যায়। নিত্যবদ্ধ জীবেদের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে এই সৃষ্টি এবং ধ্বংস সাধিত হয়। নিত্যবদ্ধ জীবেদের স্বতন্ত্রতা বোধ বা অহঙ্কার রয়েছে, যার ফলে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই ভোগ করার ক্ষমতা তাদের নেই। ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা, এবং অন্য সব কিছু হচ্ছে তাঁর ভোগের বিষয়। জীবেরা হচ্ছেন অধীন ভোক্তা। কিন্তু তাদের স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে নিত্যবদ্ধ জীবেদের প্রবল ভোগ-বাসনার উদয় হয়। এই জড় জগতে জড় পদার্থ ভোগ করার সুযোগ বদ্ধ জীবকে দেওয়া হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত সৌভাগ্যবান জীব যথার্থ সত্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে বহু জন্মান্তরের পথ বাসুদেবের চরণারবিন্দে শরণাগত হন, তাঁরা নিত্যমুক্ত আত্মাদের সঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ করেন। সেখানে প্রবেশ করার পর এই রকম সৌভাগ্যবান জীবকে আর এই জড় সৃষ্টিতে ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু যারা এই স্বরূপগত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না,তারা এই জড় জগতের প্রলয়ের পর মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। তারপর যখন আবার সৃষ্টি হয়, তখন তারা মহত্তত্ত্ব থেকে জেগে ওঠে; এই মহত্তত্ত্বে জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি রয়েছে, এমন কি বদ্ধ জীবাত্মারাও এই মহত্তত্ত্বে রয়েছে। মৌলিকভাবে এই মহত্তত্ত্বকে ষোলটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, পঞ্চভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়। মহত্তত্ত্ব অনেকটা নির্মল আকাশে মেঘের মতো। চিন্ময় জগতের সর্বত্রই ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত এবং সেখানে সব কিছুই চিন্ময় জ্যোতিতে উজ্জ্বল। অন্তহীন বিরাট চিদাকাশের এক কোণে মহত্তত্ত্ব এসে জড়ো হয়, এবং যে অংশ মহত্তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে তাকে বলা হয় জড় জগৎ। মহত্তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত এই অংশটি সমগ্র চিন্ময় জগতের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, অথচ সেই মহত্তত্ত্বের ভিতরেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলির উৎপত্তি হয় কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু থেকে, যিনি কেবলমাত্র জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এই জড় জগতকে সক্রিয় করেন।

## শ্লোক ২

**যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।**
**নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥ ২ ॥**

**যস্য**—যাঁর; **অম্ভসি**—জলে; **শয়ানস্য**—শায়িত; **যোগনিদ্রাম্**—যোগনিদ্রায়; **বিতন্বতঃ**—বিস্তারিত; **নাভি**—নাভি; **হ্রদ**—সরোবর; **অম্বুজাৎ**—পদ্ম থেকে;

**আসীৎ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **ব্রহ্মা**—সমস্ত জীবের পিতামহ ব্রহ্মা; **বিশ্ব**—বিশ্ব; **সৃজাম্**—সৃষ্টিকারী; **পতিঃ**—প্রভু।

## অনুবাদ

**পুরুষাবতারের এক অংশ গর্ভোদকে শয়ন করে যোগনিদ্রা বিস্তার করেন। তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম বিকশিত হয় এবং সেই পদ্ম থেকেই প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন।**

## তাৎপর্য

প্রথম পুরুষাবতার হচ্ছেন কারণোদকশায়ী বিষ্ণু। তাঁর রোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডগুলির প্রতিটির ভিতর তিনি আবার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের যে অর্ধাংশ তাঁর দেহ নির্গত স্বেদবিন্দুতে পূর্ণ হয়, সেখানে তিনি শয়ন করেন। এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি-সরোবর থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয়, সেটি হচ্ছে সমস্ত জীব এবং ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনকারী প্রজাপতিদের আদি পিতা ব্রহ্মার আবির্ভাব স্থান। সেই পদ্মের বোঁটায় রয়েছে চতুর্দশ ভুবন, এবং আমাদের এই ভূ-মণ্ডল তার মধ্যভাগে অবস্থিত। তার ঊর্ধ্বে রয়েছে উন্নত লোকসমূহ এবং সর্বোচ্চ লোক হচ্ছে ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক। ভূ-মণ্ডলের নিচে রয়েছে সাতটি পাতাল লোক, সেখানে অসুর এবং এই ধরনের অন্যান্য জড় জীবেরা বাস করে।

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়, যিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তাঁকে বলা হয় হরি এবং তাঁর থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অবতারদের প্রকাশ হয়।

এইভাবে তিনটি রূপে পুরুষাবতারের প্রকাশ হয়—প্রথমে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি মহত্তত্ত্ব আদি সমস্ত জড় উপাদানগুলি সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয় হচ্ছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং তৃতীয় হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি সজীব অথবা নির্জীব সমস্ত জড় বস্তুরই পরমাত্মা। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের এই রূপগুলি সম্বন্ধে অবগত তিনি ভগবানকে যথাযথভাবে জানেন এবং এইভাবে ভগবান সম্বন্ধে অবগত হয়ে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সমন্বিত জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, সে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। এই শ্লোকে মহাবিষ্ণু-তত্ত্ব সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহাবিষ্ণু তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রভাবে চিদাকাশের এক অংশে শয়ন করেন। এইভাবে তিনি কারণ-সমুদ্রে শায়িত হন এবং সেখান থেকে তিনি জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ও তার ফলে তৎক্ষণাৎ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে জড়া প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন একটি বৃক্ষ অসংখ্য সুপক্ক ফলের দ্বারা শোভিত হয়।

মালী মাটিতে গাছের বীজ বপন করে এবং যথাসময়ে গাছটি বর্ধিত হয়ে ফুলে-ফলে শোভিত হয়। কারণ ব্যতীত কোন কিছুই কার্যকরী হয় না। তাই এই সমুদ্রটির নাম 'কারণ-সমুদ্র' দেওয়া হয়েছে। এই কারণ-সমুদ্র থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হয়েছে। মূর্খের মতো নাস্তিকদের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই নাস্তিকদের সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে না যে কোনও সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, অথচ সৃষ্টি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে কোন যথার্থ যুক্তিও তারা উপস্থাপিত করতে পারে না। যেমন পুরুষের সংযোগ ব্যতিরেকে কোন স্ত্রী সন্তান উৎপাদন করতে পারে না, ঠিক তেমনই ভগবানের শক্তি ছাড়াও জড়া প্রকৃতির কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। পুরুষ গর্ভসঞ্চার করে এবং প্রকৃতি প্রসব করে। ছাগলের গলায় গলস্তন দেখতে যদিও স্তনের মতো, কিন্তু তা থেকে যেমন কখনও দুধ পাওয়া যায় না, তেমনই জড় পদার্থ থেকে কোন কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না ; আমাদের অবশ্যই পুরুষের শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে, যিনি প্রকৃতির গর্ভে বীজ সঞ্চার করেন। ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শায়িত হলেন, তখন জড়া প্রকৃতি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন। তারপর প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে শায়িত হলেন। এইভাবে ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্র এবং উপাদান তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হল। ভগবান অনন্ত শক্তির অধীশ্বর, তাই যদিও তাঁর করণীয় কিছুই নেই, তবুও তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নিখুঁত পরিকল্পনা সহকারে সব কিছুই করতে পারেন। ভগবানের সমান বা ভগবানের থেকে মহৎ কেউই নেই। সেটিই হচ্ছে বেদের সিদ্ধান্ত।

## শ্লোক ৩

**যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।**
**তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্ ॥ ৩ ॥**

**যস্য**—যাঁর ; **অবয়ব**—অবয়ব ; **সংস্থানৈঃ**—অবস্থিত ; **কল্পিতঃ**—কল্পিত ; **লোক**—জীব অধ্যুষিত গ্রহ ; **বিস্তরঃ**—বিস্তর ; **তদ্বৈ**—কিন্তু তা ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **রূপম্**—রূপ ; **বিশুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ ; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব ; **ঊর্জিতম্**—পরম উৎকর্ষ।

## অনুবাদ

**সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের বিরাট শরীরে অবস্থিত, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট এই জড় উপাদানের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ নেই। তাঁর শরীর পরম উৎকর্ষ সহকারে পরা-প্রকৃতিতে অবস্থিত।**

## তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপ অথবা বিশ্বরূপের ধারণা নির্দিষ্ট হয়েছে বিশেষ করে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের জন্য, যাদের পক্ষে ভগবানের দিব্য স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা

অত্যন্ত কঠিন। তারা মনে করে যে, রূপ মানে হচ্ছে প্রাকৃত জগতের কোনও বস্তু। তাই প্রারম্ভিক স্তরে অদ্বয় তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিপরীত ধারণার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে তারা ভগবানের শক্তি বিস্তারের ধ্যানে মনকে নিবদ্ধ করতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভগবান মহত্তত্ত্বরূপে তাঁর শক্তি বিস্তার করেন, যা হচ্ছে সমস্ত জড় উপাদানের আধার। একদিক দিয়ে বিচার করলে স্বয়ং ভগবান এবং তাঁর শক্তি একই, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহত্তত্ত্ব ভগবান থেকে ভিন্ন। তাই ভগবানের শক্তি বা ভগবান স্বয়ং একাধারে ভিন্ন এবং অভিন্ন। তাই বিশেষ করে নির্বিশেষবাদীদের জন্য বিরাট রূপের ধারণা ভগবানের নিত্য রূপ থেকে অভিন্ন। ভগবানের নিত্য বিগ্রহ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টির পূর্বেও বর্তমান ছিল এবং তাই এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ভগবানের নিত্য রূপ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির অতীত পরম উৎকর্ষ সমন্বিত চিন্ময় রূপ। ভগবানের এই দিব্য রূপ তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর অসংখ্য অবতারসমূহ সর্বদাই সেই অপ্রাকৃত স্তরেই প্রকাশিত এবং তাঁরা কখনই মহত্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত নন।

## শ্লোক ৪

**পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।**
**সহস্রমূর্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥ ৪ ॥**

**পশ্যন্তি**—দেখেন; **অদঃ**—পুরুষের রূপ; **রূপম্**—রূপ; **অদভ্র**—পূর্ণ; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **সহস্র-পাদ**—সহস্র পাদ; **উরু**—জঙ্ঘা; **ভুজ-আনন**—হস্ত এবং মুখ; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **সহস্র**—হাজার হাজার; **মূর্ধ**—মস্তক; **শ্রবণ**—কর্ণ; **অক্ষি**—আঁখি; **নাসিকম্**—নাসিকা; **সহস্র**—হাজার হাজার; **মৌলি**—মালিকা; **অম্বর**—পরনের পোশাক; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল; **উল্লসৎ**—উদ্ভাসিত।

### অনুবাদ

**ভক্তরা তাঁদের বিজ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা পরম চমৎকার অসংখ্য হস্ত-পদ-মুখ যুক্ত পুরুষের দিব্য রূপ দর্শন করেন। সেই শরীরে অসংখ্য মস্তক, কর্ণ, চক্ষু এবং নাসিকা রয়েছে। সেগুলি অসংখ্য মুকুট, উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং মালিকার দ্বারা শোভিত।**

### তাৎপর্য

আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করতে পারি না। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ হয়, তখন ভগবান স্বয়ং আমাদের কাছে প্রকাশিত হন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ত্রিগুণাতীত ভগবানকে কেবল শুদ্ধ-ভক্তির মাধ্যমেই অনুভব করা যায়। তাই বেদেও প্রতিপন্ন হয়েছে, কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে জীব ভগবন্মুখী হয়। এবং ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল ভগবান

তার হৃদয়ে প্রকাশিত হন। *ব্রহ্মসংহিতাতেও* বলা হয়েছে যে, প্রেমরূপী অঞ্জনের দ্বারা যাঁদের চক্ষু রঞ্জিত হয়েছে, সেই ভক্তরাই কেবল নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। তাই ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের তত্ত্ব সেই মহান্ পুরুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে যাঁরা প্রেমরূপ অঞ্জনে রঞ্জিত চক্ষুর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছেন। এই জড় জগতেও আমরা আমাদের চক্ষুর দ্বারা সব সময় সব কিছু দর্শন করতে পারি না; অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু দর্শন করে থাকি। জড় বিষয়েই যদি আমাদের এইভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, তা হলে চিন্ময় বিষয়ের ব্যাপারে তা আরও বেশি করে প্রয়োজন। তাই ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই কেবল আমরা পরম সত্য এবং তাঁর বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে জানতে পারি; প্রাথমিক স্তরের পরমার্থবাদীদের কাছে তিনি নিরাকার হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সুদক্ষ সেবকের কাছে তিনি তাঁর চিন্ময় রূপে প্রকাশিত।

## শ্লোক ৫

**এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।**
**যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্যঙ্নরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥**

**এতৎ**—এই (রূপ); **নানা**—বিবিধ; **অবতারাণাম্**—অবতারদের; **নিধানম্**—উৎস; **বীজম্**—বীজ; **অব্যয়ম্**—অবিনশ্বর; **যস্য**—যাঁর; **অংশ**—অংশ; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **সৃজ্যন্তে**—সৃষ্টি করেন; **দেব**—দেবতা; **তির্যক্**—পশু; **নর-আদয়ঃ**—মনুষ্য আদি।

### অনুবাদ

**এই রূপ (দ্বিতীয় পুরুষাবতার) ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত অসংখ্য অবতারদের উৎস এবং অবিনশ্বর বীজ। এই রূপের অংশ এবং কলা থেকে দেবতা, মনুষ্য আদি বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি হয়েছে।**

### তাৎপর্য

মহত্তত্ত্বে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার পর পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ অবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। তিনি যখন দেখলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে কেবল অন্ধকার এবং শূন্যস্থান রয়েছে, কিন্তু বিশ্রাম করার কোন স্থান নেই, তখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ তাঁর স্বেদবিন্দুর দ্বারা পূর্ণ করে সেই জলে শয়ন করলেন। এই জলকে বলা হয় গর্ভোদক। তারপর তাঁর নাভিপদ্ম থেকে একটি পদ্মের প্রকাশ হয়, এবং সেই পদ্মের মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ-কার্য সম্পাদন করেন, এবং ভগবান বিষ্ণুরূপে এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন। প্রকৃতির রজোগুণে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছিল এবং বিষ্ণু হচ্ছেন সত্ত্বগুণের অধীশ্বর।

বিষ্ণু যেহেতু প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত, তাই তিনি সর্বদাই এই জড় জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। এই তত্ত্ব পূর্বেই বিশ্লেষিত হয়েছে। ব্রহ্মার থেকে রুদ্র (শিব) প্রকাশিত হন, যিনি হচ্ছেন তমোগুণের পরিচালক। ভগবানের ইচ্ছায় তিনি সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করেন। তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এঁরা সকলেই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার। দক্ষ, মরীচি, মনু এবং এ রকম অনেক দেবতা ব্রহ্মাণ্ডে প্রজা সৃষ্টি করার জন্য আবির্ভূত হন। বেদে গর্ভস্তুতি মন্ত্রে এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর মহিমা কীর্তিত হয়েছে, যার শুরুতে ভগবানের সহস্র মস্তকাদির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, এবং যদিও মনে হয় যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে শায়িত রয়েছেন, তবুও সর্বদাই তিনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। এই তত্ত্বও পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশরূপ যে বিষ্ণু, তিনি হচ্ছেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা বা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামেও পরিচিত। এইভাবে আদি পুরুষের তিনটি রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ।

বিভিন্ন কল্পে বিভিন্ন অবতারের প্রকাশ হয় এবং তাঁদের সংখ্যা অনন্ত, যদিও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহ, বামন এবং অন্য অনেক অবতার। এই সমস্ত অবতারদের বলা হয় লীলা-অবতার। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব অথবা রুদ্র আদি গুণাবতার রয়েছেন, যাঁরা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের অধ্যক্ষতা করেন।

শ্রীবিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। শিব পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের মধ্যবর্তী তটস্থা অবস্থায় রয়েছেন। ব্রহ্মা সর্বদাই জীবতত্ত্ব। সব চাইতে পুণ্যবান জীব অথবা ভগবানের কোনও মহান ভক্ত সৃষ্টিকার্য সাধন করার জন্য ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, এবং তাঁকে বলা হয় ব্রহ্মা। তাঁর শক্তি অনেকটা মণি-মাণিক্যে প্রতিফলিত সূর্য-কিরণের মতো। যখন ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করার মতো কোন জীব থাকে না, তখন ভগবান নিজেই ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করেন।

শিব কোন সাধারণ জীব নন, তিনি ভগবানের অংশ। কিন্তু যেহেতু শিব সরাসরিভাবে জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তাই তিনি ঠিক বিষ্ণুর মতো পূর্ণরূপে গুণাতীত নন। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য অনেকটা দুধ এবং দইয়ের মধ্যে পার্থক্যের মতো। দই দুধ ছাড়া আর কিছু নয়, তবুও তা দুধ নয়।

পরবর্তী অবতার হচ্ছেন মনু। ব্রহ্মার এক দিনে ( যা আমাদের সৌর বৎসরের তুলনায় ৪৩,০০,০০০×১০০০ বৎসর) চৌদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়। সেই হিসাবে ব্রহ্মার এক মাসে ৪২০ জন মনুর আবির্ভাব হয় এবং এক বছরে ৫,০৪০ জন মনুর আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মার আয়ু তাঁর সময়ের হিসাবে একশ' বছর এবং তাই ব্রহ্মার জীবনে ৫,০৪,০০০ মনুর আবির্ভাব হয়। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং প্রতিটি

ব্রহ্মাণ্ডে একজন ব্রহ্মা রয়েছেন, এবং তাঁরা সকলেই পুরুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সৃষ্টি হন এবং বিনষ্ট হন। তাই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, পুরুষের এক নিঃশ্বাসে কত কোটি মনু রয়েছেন।

এই ব্রহ্মাণ্ডে যে-সমস্ত মনু অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তাঁরা হচ্ছেন ঃ স্বায়ম্ভুব মনুরূপে যজ্ঞ, স্বারোচিষ মনুরূপে বিভু, উত্তম মনুরূপে সাত্যসেন, তামস মনুরূপে হরি, রৈবত মনুরূপে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষ মনুরূপে অজিত, বৈবস্বত মনুরূপে বামন (বর্তমান মনু হচ্ছেন বৈবস্বত মনু), সাবর্ণি মনুরূপে সার্বভৌম, দক্ষসাবর্ণি মনুরূপে ঋষভ, ব্রহ্মসাবর্ণি মনুরূপে বিষ্বক্সেন, ধর্মসাবর্ণি মনুরূপে ধর্মসেতু, রুদ্রসাবর্ণি মনুরূপে সুধামা, দেবসাবর্ণি মনুরূপে যোগেশ্বর এবং ইন্দ্রসাবর্ণি মনুরূপে বৃহদ্ভানু। এইগুলি হচ্ছে ব্রহ্মার একদিনে, অর্থাৎ আমাদের সৌর বৎসরের হিসাবে ৪৩০,০০,০০,০০০ কোটি বছরে চৌদ্দজন মনুর নাম।

তারপর রয়েছেন যুগাবতারেরা। সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ এবং কলি যুগ—এই চারটি যুগ রয়েছে এবং এই চারটি যুগের যুগাবতারের গায়ের রঙ যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, শ্যাম এবং পীত। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি শ্যাম এবং কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গায়ের রং পীত।

এইভাবে ভগবানের সমস্ত অবতারদের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। কোন ভণ্ডের অবতার সাজবার অবকাশ নেই, কেন না সমস্ত অবতারের উল্লেখ শাস্ত্রে থাকবেই। কোন অবতার নিজেকে ভগবানের অবতার বলে ঘোষণা করেন না, কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানী মহর্ষিরা শাস্ত্রপ্রমাণের ভিত্তিতে অবতারের লক্ষণগুলি দেখতে পান। শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা অবতারের অবয়ব এবং কার্যকলাপ দর্শন করে অবতার চিনতে পারেন।

প্রত্যক্ষ অবতার ছাড়াও অসংখ্য শক্ত্যাবেশ অবতার রয়েছে। তাঁদের কথাও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের অবতারেরা প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। যখন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন তখন তাঁদের বলা হয় অবতার, কিন্তু যখন তাঁরা পরোক্ষভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তখন তাঁদের বলা হয় বিভূতি। প্রত্যক্ষভাবে আবিষ্ট অবতারেরা হচ্ছেন চতুঃসন, নারদ, পৃথু, শেষ, অনন্ত ইত্যাদি। ভগবদ্গীতার 'বিভূতি-যোগ' নামক দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত অবতারদের উৎস হচ্ছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু।

## শ্লোক ৬

**স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।**
**চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্যমখণ্ডিতম্ ॥ ৬ ॥**

**সঃ**—সেই; **এব**—অবশ্যই; **প্রথমম্**—প্রথম; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৌমারম্**—চার কুমার (চারজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী); **সর্গম্**—সৃষ্টি; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয়ে; **চচার**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দুশ্চরম্**—অত্যন্ত দুঃসাধ্য; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **ব্রহ্মচর্যম্**—পরম ব্রহ্মকে জানবার পন্থা; **অখণ্ডিতম্**—অখণ্ড।

## অনুবাদ

**সৃষ্টির আদিতে প্রথমে ব্রহ্মার চারজন অবিবাহিত পুত্র (চতুঃসন বা কুমারেরা) ছিলেন, যাঁরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়, প্রতিপালন হয় এবং তারপর তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নামানুসারে সৃষ্টির বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত চার কুমারেরা সৃষ্টির কৌমার অবস্থায় আবির্ভূত হন, এবং ব্রহ্ম-উপলব্ধির পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁরা ব্রহ্মচারীরূপে কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেছিলেন। এই কুমারেরা হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। কঠোর নিয়ম-কানুন পালন করে তপস্যা শুরু করার আগে তাঁরা সকলেই সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, কেবল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করলে তবেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, এবং তারপরই কেবল ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব।

## শ্লোক ৭

**দ্বিতীয়ং তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।**
**উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ সৌকরং বপুঃ ॥ ৭ ॥**

**দ্বিতীয়ম্**—দ্বিতীয়; **তু**—কিন্তু; **ভবায়**—মঙ্গলের জন্য; **অস্য**—এই পৃথিবীর; **রসাতল**—ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নতম প্রদেশ; **গতাম্**—পতিত হয়ে; **মহীম্**—পৃথিবী; **উদ্ধরিষ্যন্**—উঠিয়ে; **উপাদত্ত**—স্থাপিত করেছিলেন; **যজ্ঞেশঃ**—পরম ঈশ্বর অথবা পরম ভোক্তা; **সৌকরম্**—শূকরের (বরাহ); **বপুঃ**—রূপ।

## অনুবাদ

**এই পৃথিবী যখন রসাতলে পতিত হয়েছিল, তখন এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীকে উদ্ধার করতে ইচ্ছুক হয়ে সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু দ্বিতীয় অবতারে বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

এখানে দেখানো হয়েছে যে, শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিটি অবতারের বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপেরও উল্লেখ থাকে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতীত ভগবান কখনও অবতরণ করেন না, এবং তাঁর সেই কার্যকলাপ সর্বদাই অসাধারণ। কোন জীবের পক্ষে সেই ধরনের কার্যকলাপ সম্পাদন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বরাহ অবতারের উদ্দেশ্য ছিল রসাতল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করা। নোংরা জায়গা থেকে কোন কিছু তোলা শূকরের কাজ, এবং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান অদ্ভুত এই লীলা অসুরদের দেখিয়েছিলেন, যারা সেই নোংরা জায়গায় পৃথিবীকে লুকিয়ে রেখেছিল। পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে কোন কিছুই করা অসম্ভব নয়, এবং যদিও তিনি একটি শূকররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, তথাপি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের দ্বারা আরাধিত হয়ে পরম দিব্য অবস্থায় অবস্থান করেন।

## শ্লোক ৮

**তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।**
**তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ ॥ ৮ ॥**

**তৃতীয়ম্**—তৃতীয়; **ঋষি-সর্গম্**—ঋষিকল্পে; **বৈ**—অবশ্যই; **দেবর্ষিত্বম্**—দেবতাদের মধ্যে ঋষিরূপী অবতার; **উপেত্য**—স্বীকার করে; **সঃ**—তিনি; **তন্ত্রম্**—বেদের প্রকাশ; **সাত্বতম্**—যা বিশেষরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার উপায়; **আচষ্ট**—সংগৃহীত; **নৈষ্কর্ম্যম্**—ফলেচ্ছারহিত; **কর্মণাম্**—কর্মের; **যতঃ**—যা থেকে।

## অনুবাদ

**ঋষিকল্পে পরমেশ্বর ভগবান দেবর্ষি নারদরূপে তাঁর তৃতীয় শক্ত্যাবেশ অবতারে আবির্ভূত হন। বেদের যে সমস্ত বর্ণনা ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে জীবকে অনুপ্রাণিত করে, তিনি সেগুলি সংকলন করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

মহর্ষি নারদ, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন ধরনের জীবেদের মধ্যে সমস্ত মহান্ ভক্তই হচ্ছেন তাঁর শিষ্য। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেবও তাঁর শিষ্য। নারদ মুনি হচ্ছেন *নারদ-পঞ্চরাত্রের* প্রণেতা, যা হচ্ছে বেদে ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ক বর্ণনার সংকলন। *নারদ-পঞ্চরাত্র* সকল কর্মীদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করে। প্রায় সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই সকাম কর্মের প্রতি আকৃষ্ট, কেন না তারা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের জীবন উপভোগ করতে চায়।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সব রকম প্রজাতিই সকাম কর্মী। সকাম কর্মে নানা রকম অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যে,প্রতিটি ক্রিয়াই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং যে কোন কর্মের কর্তা সেই প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই প্রতিক্রিয়ার ফল কখনও ভাল, আবার কখনও মন্দ। ভাল কর্মের ফলে জড় জগতে আপেক্ষিক উন্নতি লাভ হয়, আর খারাপ কর্মের ফলে জড় জগতে আপেক্ষিক দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তবে জড় জগতে জীবের অবস্থা, তা সে তথাকথিত সুখদায়কই হোক অথবা দুঃখদায়কই হোক, পরিণামে তা সবই দুঃখময়। মূর্খ জড়বাদীদের কোন ধারণাই নেই যে,জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে কিভাবে নিত্য আনন্দ লাভ করা যেতে পারে। কিভাবে প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায়, শ্রীনারদ মুনি এই সমস্ত মূর্খ সকাম কর্মীদের সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জড় জগতের রোগগ্রস্ত মানুষদের শিক্ষা দেন যে, কিভাবে জীব তার বর্তমান বৃত্তি অনুসারে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে পারে। অত্যধিক দুগ্ধজাত খাদ্য আহার করার ফলে যখন কেউ অজীর্ণ জনিত রোগ ভোগ করে, তখন ডাক্তার তাকে সেই রোগ নিরাময়ের জন্য দুগ্ধ থেকে জাত আরেকটি খাদ্য দই খেতে দেন। সুতরাং, রোগের কারণ এবং রোগ নিরাময়ের ঔষধ একই দ্রব্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই নারদ মুনির মতো একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন হওয়া আবশ্যক। *ভগবদ্গীতাতে*ও ভগবানকে কর্মফল অর্পণ করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা জীবকে নৈষ্কর্ম্য বা মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

## শ্লোক ৯

**তুর্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী ।**
**ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোৎ দুশ্চরং তপঃ ॥ ৯ ॥**

**তুর্যে**—চতুর্থ অবতারে; **ধর্ম-কলা**—ধর্মরাজের পত্নী; **সর্গে**—জন্মগ্রহণ করে; **নর-নারায়ণৌ**—নর এবং নারায়ণ নামক; **ঋষী**—ঋষিগণ; **ভূত্বা**—ভূত হয়ে; **আত্ম-উপশম**—ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; **উপেতম্**—প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **দুশ্চরম্**—অত্যন্ত দুঃসাধ্য; **তপঃ**—তপশ্চর্যা।

## অনুবাদ

**চতুর্থ অবতারে ভগবান ধর্মরাজের পত্নীর গর্ভে নর এবং নারায়ণ নামক যমজ পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ইন্দ্রিয়-সংযমের আদর্শ প্রদর্শন করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

মহারাজ ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দেন যে, তপস্যা, অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার জন্য কষ্ট স্বীকার করাই হচ্ছে মানুষের একমাত্র কর্তব্য। আমাদের

শিক্ষা দান করার জন্য ভগবান স্বয়ং আচরণ করেছেন। আত্ম-বিস্মৃত জীবেদের প্রতি ভগবান অত্যন্ত কৃপালু। তাই সমস্ত বদ্ধ জীবদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি প্রদান করেন এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তানদের তাঁর প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। আজ থেকে মাত্র ৫০৭ বছর পূর্বে সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন কলিযুগের অত্যন্ত অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের কথা প্রায় সকলেরই মনে আছে। হিমালয় পর্বতে বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণ ঋষি এখনও পূজিত হন।

## শ্লোক ১০

**পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।**
**প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥ ১০ ॥**

**পঞ্চমঃ**—পঞ্চম; **কপিলঃ**—কপিল; **নাম**—নামক; **সিদ্ধেশঃ**—সিদ্ধদের মধ্যে অগ্রগণ্য; **কাল**—কাল; **বিপ্লুতম্**—লুপ্ত; **প্রোবাচ**—বলেছিলেন; **আসুরয়ে**—আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে; **সাংখ্যম্**—সাংখ্য শাস্ত্র; **তত্ত্ব-গ্রাম**—জড়-সৃষ্টির মৌলিক উপাদানের মোট সংখ্যা; **বিনির্ণয়ম্**—বিনির্ণীত।

### অনুবাদ

**পঞ্চম অবতারে তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীকপিল নামে অবতরণ করেন। তিনি আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে সৃষ্টির উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে সাংখ্য দর্শন প্রদান করেন, কেন না কালের প্রভাবে সেই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।**

### তাৎপর্য

সৃষ্টির উপাদানগুলির মোট সংখ্যা হচ্ছে চব্বিশটি। তার প্রতিটি উপাদানই সাংখ্য দর্শনে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা এই সাংখ্য দর্শনকেই সাধারণত মেট্যাফিজিক্স্ বা অধিবিদ্যা বলে থাকেন। 'সাংখ্য' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "যা অত্যন্ত সরলভাবে জড় উপাদানগুলি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে।" এই দর্শন সর্বপ্রথম শ্রীকপিলদেব প্রদান করেন, এখানে যাঁকে ভগবানের পঞ্চম অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

## শ্লোক ১১

**ষষ্ঠম্ অত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।**
**আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্ ॥ ১১ ॥**

**ষষ্ঠম্**—ষষ্ঠ; **অত্রেঃ**—অত্রির; **অপত্যত্বম্**—পুত্রত্ব; **বৃতঃ**—প্রার্থিত; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত; **অনসূয়য়া**—অনসূয়ার দ্বারা; **আন্বীক্ষিকীম্**—আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক; **অলর্কায়**—অলর্ককে; **প্রহ্লাদ-আদিভ্যঃ**—প্রহ্লাদ আদিকে; **উচিবান্**—বলেছিলেন।

## অনুবাদ

**পরম পুরুষের ষষ্ঠ অবতার হচ্ছেন মহর্ষি অত্রির পুত্র ভগবান দত্তাত্রেয়। মাতা অনসূয়ার প্রার্থনায় তিনি তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অলর্ক, প্রহ্লাদ এবং অন্য অনেককে পারমার্থিক জ্ঞান দান করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

ভগবান ঋষি অত্রি এবং অনসূয়ার পুত্র, দত্তাত্রেয়রূপে অবতীর্ণ হন। *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে* পতিব্রতা পত্নীর কথা প্রসঙ্গে দত্তাত্রেয়রূপে ভগবানের আবির্ভাবের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ঋষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের কাছে প্রার্থনা করেন, "হে প্রভুগণ, আপনারা যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, এবং আপনারা যদি আমাকে আশীর্বাদ করতে চান, তা হলে আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনারা তিনজনে যেন একত্রিত হয়ে আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।" ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব তাতে সম্মত হয়েছিলেন, দত্তাত্রেয়রূপে ভগবান অলর্ক, প্রহ্লাদ, যদু, হৈহয় এবং আরও অনেককে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান দান করেন।

## শ্লোক ১২

**ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।**
**স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎস্বায়ম্ভুবান্তরম্ ॥ ১২ ॥**

**ততঃ**—তারপর; **সপ্তমে**—সপ্তম; **আকূত্যাম্**—আকূতির গর্ভে; **রুচেঃ**—প্রজাপতি রুচির দ্বারা; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞরূপে ভগবানের অবতার; **অভ্যজায়ত**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি; **যাম-আদ্যৈঃ**—যাম আদির সঙ্গে; **সুর-গণৈঃ**—দেবতাদের সঙ্গে; **অপাৎ**—আধিপত্য করেছিলেন; **স্বায়ম্ভুব-অন্তরম্**—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে।

## অনুবাদ

**সপ্তম অবতার হচ্ছেন প্রজাপতি রুচি ও তাঁর পত্নী আকূতির পুত্র যজ্ঞ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র যাম আদি দেবতারা তাঁকে সেই কার্যে সাহায্য করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

এই জড় জগতের পরিচালনা করার অতি উচ্চ পদগুলি দান করা হয় অতি পুণ্যবান জীবদের। যখন সে রকম পুণ্যবান জীবের অভাব হয়, তখন ভগবান নিজেই ব্রহ্মা,

প্রজাপতি, ইন্দ্র আদি রূপে আবির্ভূত হন এবং পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্বায়ম্ভুব মনুর সময় (বর্তমানে এই ব্রহ্মাণ্ড বৈবস্বত মনুর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে) ইন্দ্রের পদ অধিকার করার মতো কোন উপযুক্ত জীব না থাকায় ভগবান নিজেই ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করেছিলেন। যাম আদি তাঁর পুত্র এবং অন্যান্য দেবতারা তখন তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। ভগবান যজ্ঞ তখন ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনা করেছিলেন।

## শ্লোক ১৩

**অষ্টমে মেরুদেব্যাং তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।**
**দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥**

**অষ্টমে**—অষ্টম অবতারে; **মেরুদেব্যাম্ তু**—মেরুদেবীর গর্ভে; **নাভেঃ**— মহারাজ নাভির দ্বারা; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **উরুক্রমঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **বর্ত্ম**—পথ; **ধীরাণাম্**—যথার্থ জ্ঞানীদের; **সর্ব**— সমস্ত; **আশ্রম**—জীবনের বিভিন্ন স্তর; **নমস্কৃতম্**—পূজিত।

### অনুবাদ

**ভগবানের অষ্টম অবতার হচ্ছেন মহারাজ নাভি ও তাঁর পত্নী মেরুদেবীর পুত্র মহারাজ ঋষভদেব। এই অবতারে ভগবান পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন, যে পন্থা সর্বতোভাবে জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মানুষদের দ্বারা পূজিত পরমহংসরা অবলম্বন করে থাকেন।**

### তাৎপর্য

মানব-সমাজকে প্রকৃতিগতভাবে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভাগ করা হয়েছে। চারটি বর্ণ হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে চারটি বিভাগ এবং চারটি আশ্রম হচ্ছে চেতনার ক্রম বিকাশ অনুসারে চারটি বিভাগ। বৃত্তি অনুসারে চারটি বিভাগ হচ্ছে অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষের স্তর বা ব্রাহ্মণ, পরিচালকবর্গ বা ক্ষত্রিয়, উৎপাদক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা বৈশ্য এবং শ্রমিক সম্প্রদায় বা শূদ্র; এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি বিভাগ হচ্ছে পারমার্থিক চেতনার উন্নতির পথে চারটি স্তর। তার মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম বা সর্বত্যাগীর জীবন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের গুরু। সন্ন্যাস আশ্রমেও চারটি স্তর রয়েছে, সেগুলি হচ্ছে কুটীচক, বহূদক, পরিব্রাজকাচার্য এবং পরমহংস। পরমহংস স্তর হচ্ছে পূর্ণতার চরম স্তর এবং তাই পরমহংস সকলেরই পূজ্য। মহারাজ নাভি এবং মেরুদেবীর পুত্র মহারাজ ঋষভদেব ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অবতার, এবং তিনি তাঁর পুত্রদের তপশ্চর্যা পালন করার মাধ্যমে চিত্তবৃত্তি সংশোধন করে নিত্য আনন্দে মগ্ন হওয়ার পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। প্রতিটি জীবই আনন্দের

অন্বেষণ করছে, কিন্তু কেউই জানে না অন্তহীন শাশ্বত আনন্দ কোথায় পাওয়া যায়। মূর্খ মানুষেরা জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের মাধ্যমে আনন্দের অন্বেষণ করে, কিন্তু এই ধরনের মূর্খ মানুষেরা ভুলে যায় যে ইন্দ্রিয়-সুখ-তর্পণের মাধ্যমে লব্ধ এই অনিত্য সুখ কুকুর-বেড়ালেরাও উপভোগ করে। এই ইন্দ্রিয়-সুখ থেকে কোন পশু-পক্ষী বা কীট-পতঙ্গও বঞ্চিত নয়। সব রকমের জীবের মধ্যে এমন কি মনুষ্য জীবনেও এই ধরনের সুখ প্রচুর পরিমাণে লাভ করা যায়। কিন্তু এই ধরনের সস্তা সুখ উপভোগ করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দিব্য-জ্ঞান লাভ করে নিত্য, শাশ্বত, অন্তহীন আনন্দ উপভোগ করা। এই দিব্য-জ্ঞান লাভ করা যায় তপশ্চর্যার মাধ্যমে। 'তপশ্চর্যা' কথাটির অর্থ হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কষ্ট স্বীকার করা এবং জড় সুখভোগ থেকে বিরত হওয়া। যারা জড় সুখভোগ থেকে বিরত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের বলা হয় 'ধীর' অর্থাৎ যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিচলিত হন না। এই ধরনের ধীররাই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁরা ধীরে ধীরে পরমহংস স্তরে উন্নীত হতে পারেন, যে স্তর সমাজের সমস্ত মানুষের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকে। মহারাজ ঋষভদেব এই পন্থা প্রদর্শন করে গিয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের চরম স্তরে তিনি জড় দেহের সমস্ত প্রয়োজনগুলি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। এই স্তর অত্যন্ত উন্নত, এবং মূর্খের মতো তা অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এই স্তরের মানুষদের পূজা করা উচিত।

## শ্লোক ১৪

**ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।**
**দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥ ১৪ ॥**

**ঋষিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **ভেজে**—স্বীকৃত; **নবমম্**—নবম; **পার্থিবম্**—পৃথিবীর রাজা; **বপুঃ**—শরীর; **দুগ্ধ**—দোহন করে; **ইমাম্**—এই সমস্ত; **ওষধীঃ**—পৃথিবী থেকে উৎপন্ন; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **তেন**—দ্বারা; **অয়ম্**—এই; **সঃ**—তিনি; **উশত্তমঃ**—কমনীয়তম।

### অনুবাদ

**হে বিপ্রগণ, ঋষিদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে নবম অবতারে ভগবান পৃথুরূপে রাজদেহ ধারণ করেছিলেন। এই পৃথিবীর ওষধীসমূহকে তিনি দোহন করেছিলেন। তাই পৃথিবী তখন পরম কমনীয় হয়ে উঠেছিল।**

### তাৎপর্য

মহারাজ পৃথুর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর পিতা বেনের অনাচারের ফলে সর্বত্র প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তখন সমাজের সমস্ত বুদ্ধিমান ও উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা,

অর্থাৎ ঋষিরা এবং ব্রাহ্মণেরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে সেই অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন; রাজার কর্তব্য হচ্ছে ধর্মপরায়ণ হওয়াএবং তাঁর প্রজাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা। যখনই রাজা তাঁর এই কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে অবহেলা করেন, তখন সমাজের বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা। সমাজের অতি উন্নত শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা কিন্তু নিজেরা সিংহাসন অধিকার করে বসেন না, কেন না জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁদের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রয়েছে। রাজসিংহাসন অধিকার করার পরিবর্তে তাঁরা ভগবানকে অবতরণ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তাঁদের সেই প্রার্থনা শুনে ভগবান মহারাজ পৃথুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যথার্থ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা অথবা বিচক্ষণ ব্রাহ্মণেরা কখনও রাজনৈতিক পদ প্রাপ্ত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। মহারাজ পৃথু পৃথিবীকে কর্ষণ করে বহু সম্পদ উৎপাদন করেছিলেন, এবং তাঁর মতো এক মহান্ রাজাকে পেয়ে প্রজারাই কেবল সুখী হয় নি, সেই সঙ্গে পৃথিবীও পরম কমনীয় রূপ ধারণ করেছিল।

## শ্লোক ১৫

**রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসম্প্লবে।**
**নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥ ১৫ ॥**

**রূপম্**—রূপ; **সঃ**—তিনি; **জগৃহে**—ধারণ করেছিলেন; **মাৎস্যম্**—মৎস্যের; **চাক্ষুষ**—চাক্ষুষ; **উদধি**—জল; **সম্প্লবে**—প্লাবন; **নাবি**—নৌকার উপর; **আরোপ্য**—রেখে; **মহী**—পৃথিবী; **ময্যাম্**—নিমজ্জিত ছিল; **অপাৎ**—রক্ষিত; **বৈবস্বতম্**—বৈবস্বত; **মনুম্**—মানবকুলের পিতা মনু।

### অনুবাদ

**চাক্ষুষ মন্বন্তরে যখন মহাপ্লাবন হয় এবং সমস্ত পৃথিবী জলের অতল তলে নিমজ্জিত হয়, তখন ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করে বৈবস্বত মনুকে একটি নৌকার উপর রেখে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

*শ্রীমদ্ভাবতের* আদি ভাষ্যকার শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে, প্রত্যেক মনুর অবসানে প্রলয় হয় না। তবে চাক্ষুষ মনুর অবসানে এই প্রলয় হয়েছিল, মহারাজ সত্যব্রতকে কিছু অদ্ভুত কার্যকলাপ প্রদর্শন করবার জন্য। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী বিষ্ণু-ধর্মোত্তর, *মার্কণ্ডেয় পুরাণ,* হরিবংশ ইত্যাদি শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করে গেছেন যে, প্রত্যেক মনুর অবসানেই প্রলয় হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও শ্রীজীব গোস্বামীকে সমর্থন করেছেন এবং তিনি *ভাগবতামৃত* থেকে প্রত্যেক মনুর অবসানে

প্লাবন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্ত সত্যব্রতের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য সেই বিশেষ কল্পে অবতরণ করেছিলেন।

## শ্লোক ১৬

**সুরাসুরাণামুদধিং মথতাং মন্দরাচলম্।**
**দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥ ১৬ ॥**

**সুর**—ভগবৎ-বিশ্বাসী ভক্তগণ; **অসুরাণাম্**—ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকদের; **উদধিম্**—সমুদ্রে; **মথতাম্**—মন্থনকারী; **মন্দরাচলম্**—মন্দরাচল পর্বত; **দধ্রে**—ধারণ করেছিলেন; **কমঠ**—কূর্ম; **রূপেণ**—রূপে; **পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠে; **একাদশে**—একাদশ অবতারে; **বিভুঃ**—মহান।

### অনুবাদ

**একাদশ অবতারে ভগবান কূর্মরূপ পরিগ্রহ করে তাঁর পৃষ্ঠে মন্দরাচল পর্বতকে ধারণ করেছিলেন, যা সমুদ্র-মন্থনকারী দেবতা এবং দানবেরা মন্থন-দণ্ডরূপে ব্যবহার করেছিল।**

### তাৎপর্য

এক সময় দেবতা এবং অসুরেরা অমর হওয়ার জন্য অমৃত লাভের আশায় সমুদ্র মন্থন করেছিল। সেই সময় তারা মন্দরাচল পর্বতকে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার করছিল, এবং ভগবান তখন কূর্মরূপ পরিগ্রহ করে সমুদ্রগর্ভে তাঁর পৃষ্ঠে সেই পর্বতকে ধারণ করেছিলেন।

## শ্লোক ১৭

**ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।**
**অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥ ১৭ ॥**

**ধান্বন্তরম্**—ধন্বন্তরি নামক ভগবানের অবতার; **দ্বাদশমম্**—দ্বাদশ; **ত্রয়ো-দশমম্**—ত্রয়োদশ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **অপায়য়ৎ**—পান করতে দিয়েছিলেন; **সুরান্**—দেবতাদের; **অন্যান্**—অন্যদের; **মোহিন্যা**—মোহিনী রূপের দ্বারা; **মোহয়ন্**—প্রলুব্ধ; **স্ত্রিয়া**—স্ত্রীরূপে।

### অনুবাদ

**দ্বাদশ অবতারে ভগবান ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ত্রয়োদশ অবতারে তিনি মোহিনীরূপে অসুরদের সম্মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করতে দিয়েছিলেন।**

## শ্লোক ১৮

**চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জিতম্ ।**
**দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্যথা ॥ ১৮ ॥**

**চতুর্দশম্**—চতুর্দশ ; **নারসিংহম্**—ভগবানের অর্ধ নর ও অর্ধ সিংহরূপ অবতার ; **বিভ্রৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন ; **দৈত্যেন্দ্রম্**—দৈত্যদের রাজা ; **ঊর্জিতম্**—দৃঢ়ভাবে নির্মিত ; **দদার**—বিদীর্ণ করেছিলেন ; **করজৈঃ**—নখের দ্বারা ; **ঊরৌ**—ঊরুতে ; **এরকাম্**—তৃণবিশেষ ; **কট-কৃৎ**—সূত্রধর ; **যথা**—যেমন।

### অনুবাদ

**চর্তুদশ অবতারে ভগবান নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর নখের দ্বারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সুদৃঢ় শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন সূত্রধর এরকা তৃণ বিদীর্ণ করে।**

## শ্লোক ১৯

**পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ ।**
**পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ১৯ ॥**

**পঞ্চদশম্**—পঞ্চদশ ; **বামনকম্**—বামন ; **কৃত্বা**—ধারণ করে ; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন ; **অধ্বরম্**—যজ্ঞ-স্থানে ; **বলেঃ**—বলী মহারাজের ; **পদ-ত্রয়ম্**—কেবল ত্রিপাদ ভূমি ; **যাচমানঃ**—ভিক্ষা করে ; **প্রত্যাদিৎসুঃ**—ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় ; **ত্রি-পিষ্টপম্**—ত্রিভুবন।

### অনুবাদ

**পঞ্চদশ অবতারে ভগবান বামনরূপ ধারণ করে দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থানে গমন করেছিলেন। যদিও তিনি দেবতাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ত্রিভুবন অধিকার করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি কেবল ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান ভগবান ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সার্বভৌমত্ব দান করতে পারেন, এবং তেমনই তিনি ইচ্ছা করলে ছোট্ট একখণ্ড ভূমি ভিক্ষা করার অছিলায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য ছিনিয়ে নিতে পারেন।

## শ্লোক ২০

**অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।**
**ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥ ২০ ॥**

**অবতারে**—ভগবানের অবতারে; **ষোড়শমে**—ষোড়শ; **পশ্যন্**—দেখে; **ব্রহ্ম-দ্রুহঃ**—ধর্মাচার-পরাঙ্মুখ দেব-দ্বিজ বিরোধী; **নৃপান্**—নৃপতিবর্গ; **ত্রিঃ-সপ্ত**—একুশ-বার; **কৃত্বঃ**—করেছিলেন; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **নিঃ**—বিনাশ; **ক্ষত্রাম্**—ক্ষত্রিয়দের; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **মহীম্**—পৃথিবী।

### অনুবাদ

**ষোড়শ অবতারে ভগবান ভৃগুপতিরূপে অবতীর্ণ হয়ে ক্ষত্রিয় রাজাদের দেব-দ্বিজ বিদ্বেষী দেখে তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় বা সমাজের পরিচালকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ বা তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের নির্দেশ অনুসারে পৃথিবীকে পরিচালনা করা। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে রাজন্যবর্গকে উপদেশ দান করেন এবং তাঁদের উপদেশ অনুসারে রাজন্যবর্গ পৃথিবীকে পরিচালনা করেন। যখন ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অমান্য করে, তখন বলপূর্বক তাদের অপসারিত করা হয় এবং যোগ্যতর শাসন-ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়।

## শ্লোক ২১

**ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।**
**চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥ ২১ ॥**

**ততঃ**—তারপর; **সপ্তদশে**—সপ্তদশ অবতারে; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **সত্যবত্যাম্**—সত্যবতীর গর্ভে; **পরাশরাৎ**—পরাশর মুনির দ্বারা; **চক্রে**—প্রস্তুত করেছিলেন; **বেদ-তরোঃ**—বৈদিক কল্পবৃক্ষের; **শাখাঃ**—শাখাসমূহ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পুংসঃ**—জনসাধারণ; **অল্পমেধসঃ**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন।

### অনুবাদ

**তারপর সপ্তদশ অবতারে ভগবান শ্রীব্যাসদেবরূপে পরাশর মুনির পত্নী সত্যবতীর গর্ভে আবির্ভূত হন। মানবকুলের ভিতর বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা দর্শন করে তিনি তাদের কল্যাণের জন্য বেদবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

মূল বেদ একটি। কিন্তু শ্রীল ব্যাসদেব সেই মৌলিক বেদকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—সাম, ঋক্, যজুঃ, অথর্ব এবং তারপর আবার তিনি *পুরাণ* এবং *মহাভারত* আদি বিভিন্ন শাখায় তাদের ব্যাখ্যা করেন। বেদের ভাষা এবং বেদের বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তা কেবল অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণেরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু এই কলিযুগের অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত মূর্খ। এমন কি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষেরাও স্ত্রী এবং শূদ্রের মতো অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা সাধারণত সংস্কারের মাধ্যমে চেতনার বিকাশ করে থাকে, কিন্তু এই যুগের অত্যন্ত কলুষিত প্রভাবের ফলে তথাকথিত ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষেরা এবং উচ্চবর্ণের মানুষেরাও উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন নয়। তাদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু, অর্থাৎ দ্বিজ-কুলোদ্ভূত হলেও দ্বিজগুণসম্পন্ন নয়। এই দ্বিজবন্ধুদের স্ত্রী এবং শূদ্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। শ্রীল ব্যাসদেব বেদকে বিভিন্ন শাখা এবং উপশাখায় বিভক্ত করেছিলেন, যাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের কাছে বেদের যথার্থ তাৎপর্য সহজবোধ্য হয়।

## শ্লোক ২২

**নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্যচিকীর্ষয়া।**
**সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্যাণ্যতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥**

**নর**—মানুষ; **দেবত্বম্**—দেবত্ব; **আপন্নঃ**—রূপ ধারণ করে; **সুর**—দেবতারা; **কার্য**—কার্যকলাপ; **চিকীর্ষয়া**—সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে; **সমুদ্র**—ভারত মহাসাগর; **নিগ্রহ-আদীনি**—নিয়ন্ত্রণ আদি; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **বীর্যাণি**—অলৌকিক শক্তি; **অতঃ পরম্**—তারপর।

### অনুবাদ

**অষ্টাদশ অবতারে ভগবান শ্রীরামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেবতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি সেতুবন্ধন তথা রাবণ-বধ আদি কার্য সম্পাদন করে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই ধরাধামে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার অধিকর্তা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদনকারী বহু অলৌকিক লীলা সম্পাদন করেছিলেন। কখনও কখনও রাবণ, হিরণ্যকশিপু আদি

ভগবৎ-বিদ্বেষী রাক্ষস এবং দৈত্যরা জড়-বিজ্ঞানের প্রগতির মাধ্যমে প্রভূত জাগতিক উন্নতি সাধন করে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়, এবং পরমেশ্বর ভগবানের আধিপত্যকে অবজ্ঞা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জড় উপায়ের দ্বারা অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ। বিভিন্ন গ্রহের পৃথক পৃথক অবস্থা রয়েছে এবং ভগবানের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন বর্ণের জীব বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পাদন করার জন্য সেখানে রয়েছে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র জড়-জাগতিক সাফল্যের গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবদ্বিমুখ জড়বাদীরা কখনও কখনও ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। রাবণ ছিল তাদের একজন, এবং সে যোগ্যতার কথা বিবেচনা না করে সকলের স্বর্গে যাওয়ার জন্য জড় উপায়ে একটি সিঁড়ি তৈরি করতে চেয়েছিল। সে সরাসরি স্বর্গে যাওয়ার এমন একটি সিঁড়ি তৈরি করতে চেয়েছিল, যাতে মানুষ পুণ্যকর্ম না করেই স্বর্গে চলে যেতে পারে। সে ভগবানের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে আরও অনেক কিছু করতে চেয়েছিল। সে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। রামচন্দ্র দেবতাদের প্রার্থনা অনুসারে এই রাক্ষসকে দণ্ডদান করার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি রাবণের এই বিরুদ্ধাচরণের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলেন, যা বিস্তারিতভাবে রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র যেহেতু ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি নানা রকম অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন, যা রাবণের মতো জড় বিষয়ে উন্নত রাক্ষসেরা কখনও সম্পাদন করতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র ভাসমান শিলার দ্বারা ভারত মহাসাগরের বুকে এক সেতু নির্মাণ করেছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বস্তুর ভারহীনতা সম্বন্ধে নানা গবেষণা করছে, কিন্তু কখনও কোন অবস্থাতেই ভারহীনতা সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবান তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র বিরাট বিরাট সমস্ত গ্রহগুলিকে ভারহীন করে মহাশূন্যে ভাসিয়ে রেখেছেন। তিনি এই পৃথিবীতেও পাথরকে ভারহীন করে উদ্বেলিত মহাসাগরের বুকে স্তম্ভহীন প্রস্তরসেতু নির্মাণ করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে ভগবানের শক্তির প্রকাশ।

## শ্লোক ২৩

**একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।**
**রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥ ২৩ ॥**

**একোনবিংশে**—ঊনবিংশতিতে; **বিংশতিমে**—বিংশতিতেও; **বৃষ্ণিষু**—বৃষ্ণিকুলে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **জন্মনী**—জন্ম; **রাম**—বলরাম; **কৃষ্ণৌ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ইতি**—এই-ভাবে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অহরৎ**—দূর করেছিলেন; **ভরম্**—ভার।

## অনুবাদ

**ঊনবিংশতি এবং বিংশতি অবতরণে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃষ্ণিকুলে (যদু-বংশে) আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর ভার গ্রহণ করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে বিশেষভাবে 'ভগবান্' শব্দটির ব্যবহার এই ইঙ্গিত করছে যে, বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের মুখ্য রূপ। পরে তা আরও বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এই অধ্যায়ের শুরু থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি—শ্রীকৃষ্ণ পুরুষের অবতার নন, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী পরমেশ্বর ভগবান, এবং বলরাম হচ্ছেন তাঁর প্রথম অংশ-প্রকাশ। বলরামের থেকে আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্নের প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বাসুদেব এবং বলদেব হচ্ছেন সঙ্কর্ষণ।

## শ্লোক ২৪

**ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।**
**বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥**

**ততঃ**—তারপর; **কলৌ**—কলিযুগে; **সম্প্রবৃত্তে**—আসার পর; **সম্মোহায়**—সম্মোহিত করার উদ্দেশ্যে; **সুর**—আস্তিক; **দ্বিষাম্**—ঈর্ষাপরায়ণ; **বুদ্ধঃ**—ভগবান বুদ্ধদেব; **নাম্না**—নামক; **অঞ্জন-সুতঃ**—অঞ্জনার পুত্র; **কীকটেষু**—বিহারের গয়া প্রদেশ; **ভবিষ্যতি**—হবে।

## অনুবাদ

**তারপর কলিযুগের প্রারম্ভে ভগবান ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকদের সম্মোহিত করার জন্য বুদ্ধদেব নামে গয়া প্রদেশে অঞ্জনার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন।**

## তাৎপর্য

ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বুদ্ধদেব অঞ্জনার পুত্ররূপে গয়া প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করেন এবং বেদ-বিহিত পশুবলিরও নিন্দা করেন। বুদ্ধদেব যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন মানুষ অত্যন্ত নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল। তারা মাংসাহার-প্রিয় এবং বৈদিক যজ্ঞের নামে সব জায়গাই কসাইখানাতে পরিণত হয়েছিল। তখন অবৈধভাবে অসংখ্য পশুবলি হচ্ছিল। নিরীহ পশুদের প্রতি সদয় হয়ে ভগবান তখন শ্রীবুদ্ধদেবরূপে অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন যে, তিনি বৈদিক নির্দেশ মানেন না এবং পশুহত্যার ফলে মনোবৃত্তি যে কিভাবে কলুষিত হয়ে যায়, সে কথা তিনি মানুষদের

বুঝিয়েছিলেন। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানরহিত কলিযুগের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁর সেই তত্ত্ব অনুসরণ করেছিল এবং নীতিবোধ ও অহিংসা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে ভগবৎ-উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছিল। তিনি এইভাবে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানবিহীন নাস্তিকদের বিমোহিত করেছিলেন। এই সমস্ত নাস্তিকেরা, যারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল তারা ভগবানকে মানত না, কিন্তু তারা তাঁকে পূর্ণরূপে মেনেছিল এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েছিল, যিনি নিজেই ছিলেন ভগবানের অবতার। এইভাবে বুদ্ধরূপে তিনি অবিশ্বাসী নাস্তিকদের আস্তিকে পরিণত করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে বুদ্ধদেবের দয়াঃ তিনি নাস্তিকদের আস্তিকে পরিণত করেছিলেন।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে পশুবলিই ছিল সমাজের সব চাইতে লক্ষণীয় আচরণ। লোকেরা দাবি করত যে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে সেই সমস্ত পশু বলি হচ্ছে। আদর্শ পরম্পরার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান লাভ না হলে বেদের অনিয়মিত পাঠক তার আলঙ্কারিক ভাষার প্রভাবে বিপথগামী হয়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, এই ধরনের তত্ত্বজ্ঞানবিহীন তথাকথিত পণ্ডিতেরা যারা তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুর কাছ থেকে পরম্পরা ধারায় এই অপ্রাকৃত বাণী গ্রহণ করতে চায় না, তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলির ঊর্ধ্বে বেদের মুখ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞই থেকে যায়। তাদের জ্ঞানের কোন গভীরতা নেই। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বৈদিক পন্থা ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পথে জীবকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা এবং তাদের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করা। যখন এই সম্বন্ধ সম্পর্কে জানা হয়, তখন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার শুরু হয় এবং তার ফলে অত্যন্ত সরলভাবে জীবনের পরম উদ্দেশ্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ সুগম হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বেদের অবৈধ পাঠকেরা কেবল বৈদিক সংস্কারগুলির দ্বারাই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার ফলে তাদের স্বাভাবিক প্রগতি ব্যাহত হয়।

আসুরিকভাবাপন্ন এই ধরনের বিভ্রান্ত মানুষদের কাছে বুদ্ধদেব হচ্ছেন আস্তিকতার প্রতীক। তাই তিনি সর্বপ্রথমে তাদের পশুহত্যা করা থেকে বিরত করেন। ভগবৎ-চেতনা বিকাশের পথে পশুহত্যা হচ্ছে সব চাইতে ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধক। দু'রকমের পশুঘাতী রয়েছে। আত্মাকে কখনও কখনও 'পশু' অথবা জীব বলা হয়। তাই যারা পারমার্থিক জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা না করে আত্মঘাতী হয়, তারাও পশুঘাতী বা পশুঘ্ন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বলেছেন যে, পশুঘাতীরা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য মহিমা আস্বাদন করতে পারে না। তাই মানুষকে যদি ভগবৎ ভক্তির পথে পরিচালিত করতে হয়, তা হলে সর্বপ্রথম তাদের পশুহত্যা থেকে বিরত করতে হবে। যারা বলে

যে পশুহত্যার সঙ্গে পারমার্থিক প্রগতির কোন সম্বন্ধনেই, তারা এক-একটি মূর্খ। এই ভয়ঙ্কর মতবাদের প্রভাবে কলির চেলা কয়েকজন তথাকথিত সন্ন্যাসী বেদের নাম করে পশুহত্যায় লিপ্ত হচ্ছে এবং অন্যদের সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মৌলানা চাঁদ কাজীর আলোচনার কথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে যে পশুবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে কসাইখানায় অবিধিপূর্বক যে পশুহত্যা হচ্ছে তার পার্থক্য অনেক। অসুরেরা অথবা তথাকথিত বেদজ্ঞরা বেদে পশুবলির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে, কিন্তু সেই পশুবলি যে প্রকৃতপক্ষে কি তা তাদের জানা নেই। তাই বুদ্ধদেব আপাতভাবে বেদকে অস্বীকার করেছিলেন। পশুহত্যাজনিত প্রচণ্ড পাপ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য এবং যে সমস্ত মানুষ মুখে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, সাম্য এবং স্বাধীনতার বাণী আউড়ে কাজের বেলায় নৃশংসভাবে নিরীহ পশুদের হত্যা করে, তাদের হাত থেকে পশুদের রক্ষা করার জন্য বুদ্ধদেব এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যেখানে পশুহত্যা হয়, সেখানে ন্যায় নীতির কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। বুদ্ধদেব সর্বতোভাবে এই পশুহত্যা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর এই অহিংসার বাণী প্রচারিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেবের দর্শনকে ব্যবহারিক পরিভাষায় 'প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ' বলে বর্ণনা করা হয়। কেন না এই মতবাদে পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীকার করা হয়নি এবং বেদের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু আসলে তা হচ্ছে নাস্তিকদের বিমোহিত করে ভগবন্মুখী করার একটি ব্যবস্থা। বুদ্ধদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অবতার। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের আদি প্রবর্তক। তাই তিনি বৈদিক তত্ত্বদর্শন কখনই অস্বীকার করতে পারেন না। বাহ্যিকভাবে তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু 'সুর-দ্বিষ' বা অসুরদের জন্য, যারা সব সময় ভগবদ্বিদ্বেষী এবং যারা বেদের অজুহাত দেখিয়ে গো-হত্যা অথবা পশুহত্যা সমর্থন করতে চায়, তাদের সেই জঘন্য কার্যকলাপ রোধ করবার জন্য বুদ্ধদেবকে সর্বতোভাবে বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে হয়েছিল। তাঁর কার্য-সিদ্ধির জন্য কেবল তিনি এটি করেছিলেন। তা না হলে তাঁকে ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করা হত না; তা না হলে জয়দেব আদি বৈষ্ণব আচার্যরা তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করতেন না। বুদ্ধদেব বেদের প্রারম্ভিক সিদ্ধান্ত তৎকালীন জনসাধারণের উপযোগী করে প্রচার করেছিলেন বেদের যথার্থ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য (এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাই করেছিলেন)। এইভাবে বুদ্ধদেব এবং শঙ্করাচার্য ভগবৎ-বিশ্বাসের পথ প্রশস্ত করে গিয়েছিলেন, এবং বৈষ্ণব আচার্যরা, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণরূপে ভগবৎ-চেতনা বিকাশের পথে মানুষকে পরিচালিত করেছিলেন।

মানুষ যে বুদ্ধদেবের অহিংস আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করছে, তা দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি। কিন্তু তারা কি এই বিষয়টি যথার্থ ঐকান্তিকতা

সহকারে গ্রহণ করবে এবং সমস্ত কসাইখানাগুলি বন্ধ করবে? তা যদি না হয়, তা হলে অহিংসার বাণীর কোন অর্থ হয় না।

*শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা হয়েছিল কলিযুগ আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্বে (আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে), এবং বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় ২৬০০ বছর আগে। এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বুদ্ধদেবের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এমনই হচ্ছে এই অমল শাস্ত্রটির প্রামাণিকতা। এ রকম বহু ভবিষ্যদ্বাণী ভাগবতে রয়েছে, এবং সেগুলি একের পর এক ফলপ্রসূ হচ্ছে। তার ফলে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মহিমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যা প্রকৃতপক্ষে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব—এই চারটি দোষ থেকে মুক্ত। মুক্ত পুরুষেরা এই সমস্ত দোষের অতীত, তাঁরা ভবিষ্যতকে দর্শন করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন এবং তা কখনও বিফল হয় না।

## শ্লোক ২৫

**অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।**
**জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥ ২৫ ॥**

**অথ**—তারপর; **অসৌ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **যুগসন্ধ্যায়াম্**—যুগের সন্ধিক্ষণে; **দস্যু**—দস্যু; **প্রায়েষু**—প্রায়; **রাজসু**—রাজারা; **জনিতা**—জন্মগ্রহণ করবেন; **বিষ্ণু-যশসঃ**—বিষ্ণুযশ; **নাম্না**—নামক; **কল্কিঃ**—কল্কি নামক ভগবানের অবতার; **জগৎপতিঃ**—জগতের পতি।

## অনুবাদ

**তারপর দ্বাবিংশ অবতারে যুগ সন্ধিকালে, অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যুপ্রায় হয়ে যাবে, তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন।**

## তাৎপর্য

এখানে ভগবানের কল্কি অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি যুগ-সন্ধ্যায়, অর্থাৎ কলিযুগের শেষ এবং সত্য যুগের শুরুতে দুটি যুগের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হবেন। দেওয়াল-পঞ্জীর (ক্যালেণ্ডার) মাসের মতো সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারটি যুগ আবর্তিত হয়। এই কলিযুগের স্থায়িত্ব হচ্ছে ৪,৩২,০০০ বছর। তার মধ্যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকালের শুরু থেকে ৫,০০০ বছর গত হয়েছে। সুতরাং, কলিযুগের আরও ৪,২৭,০০০ বছর বাকি রয়েছে। সেই সময়ের পর কল্কি অবতারের আবির্ভাব হবে, যে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তাঁর পিতা হবেন বিষ্ণুযশ নামক এক তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, এবং তিনি যে সম্ভল গ্রামে আবির্ভূত হবেন তারও উল্লেখ সেখানে রয়েছে। পূর্বের বর্ণনা

অনুসারে এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যথাসময়ে সত্য বলে প্রমাণিত হবে। সেটিই হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রামাণিকতার পরিচায়ক।

## শ্লোক ২৬

**অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।**
**যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥**

**অবতারাঃ**—অবতারসমূহ; **হি**—অবশ্যই; **অসংখ্যেয়াঃ**—অসংখ্য; **হরেঃ**— ভগবান শ্রীহরির; **সত্ত্ব-নিধেঃ**—সত্ত্বগুণের সমুদ্র; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **যথা**—যথাযথ; **অবিদাসিনঃ**—অক্ষয়; **কুল্যাঃ**—ছোট ছোট নদী; **সরসঃ**—বিশাল সরোবর; **স্যুঃ**—হয়; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার।

### অনুবাদ

**হে ব্রাহ্মণগণ, বিশাল জলাশয় থেকে যেমন অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনই ভগবানের থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হন।**

### তাৎপর্য

ভগবানের অবতারের যে তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয়। তা কেবল সমস্ত অবতারের আংশিক দিগ্‌দর্শন। আরও অসংখ্য অবতার রয়েছেন, যেমন হয়গ্রীব, হরি, হংস, পৃষ্ণিগর্ভ, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, সার্বভৌম, বিষ্বক্‌সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্‌ভানু ইত্যাদি বহু বহু অবতার। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, "হে ভগবান, আপনার করুণা অপরিসীম। তাই আপনি জলচর, উদ্ভিদ, কীট, পক্ষী, বনচর, মনুষ্য, দেবতা আদি সমস্ত যোনিতে অবতরণ করেন সাধুদের পরিত্রাণ করবার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করবার জন্য। এইভাবে বিভিন্ন যুগের আবশ্যকতা অনুসারে আপনি আবির্ভূত হন। কলিযুগে আপনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।" কলিযুগে ভগবানের এই অবতার হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি অন্যান্য বহু শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *ব্রহ্ম-সংহিতাতেও* বলা হয়েছে যে, যদিও রাম, নৃসিংহ, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম ইত্যাদি ভগবানের বহু অবতার রয়েছেন, তবুও ভগবান স্বয়ং কখনও কখনও অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই অবতার নন, তাঁরা হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। সে কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। তাই ভগবান হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অক্ষয় উৎস। ভগবানের অবতারদের চেনা যায় তাঁদের অলৌকিক কার্যকলাপের মাধ্যমে, যা অন্য কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। সেটিই হচ্ছে ভগবানের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শক্তিসম্পন্ন অবতারদের চেনবার উপায়। যে সমস্ত অবতারদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রায় সকলেই

অংশ-অবতার। যেমন, চতুঃসনেরা হচ্ছেন দিব্য জ্ঞানের আবেশ অবতার, নারদ মুনি হচ্ছেন ভক্তির আবেশ অবতার। মহারাজ পৃথু হচ্ছেন কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করার শক্তির দ্বারা আবিষ্ট অবতার। মৎস্য অবতার হচ্ছেন ভগবানের প্রত্যক্ষ অংশ-অবতার। এইভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবানের অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হচ্ছেন, ঠিক যেভাবে জলাশয় থেকে নিরন্তর জল প্রবাহিত হয়।

## শ্লোক ২৭

**ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।**
**কলাঃ সর্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥**

**ঋষয়ঃ**—সমস্ত ঋষিরা; **মনবঃ**—সমস্ত মনুরা; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **মনু-পুত্রাঃ**—মনুর সমস্ত বংশধরেরা; **মহা-ওজসঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কলাঃ**—অংশের অংশ; **সর্বে**—সকলে; **হরেঃ**—ভগবানের; **এব**—অবশ্যই; **স-প্রজাপতয়ঃ**—প্রজাপতিগণ সহ; **স্মৃতাঃ**—জ্ঞাত।

### অনুবাদ

**সমস্ত ঋষি, মনু, দেবতা এবং মনুর বংশধরেরা যাঁরা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন, তাঁরাও হচ্ছেন ভগবানের অংশ এবং কলা। প্রজাপতিরাও এই অংশ ও কলার অন্তর্গত।**

### তাৎপর্য

যাঁরা তুলনামূলকভাবে কম শক্তিসম্পন্ন তাঁদের বলা হয় বিভূতি, এবং যাঁরা অধিক শক্তিশালী তাঁদের বলা হয় আবেশ অবতার।

## শ্লোক ২৮

**এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।**
**ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৮ ॥**

**এতে**—এই সমস্ত; **চ**—এবং; **অংশ**—অংশ; **কলাঃ**—অংশের অংশ; **পুংসঃ**—পরম পুরুষের; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **তু**—কিন্তু; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ইন্দ্র-অরি**—ইন্দ্রের শত্রুরা; **ব্যাকুলম্**—বিচলিত; **লোকম্**—সমস্ত গ্রহ; **মৃড়য়ন্তি**—রক্ষা করেন; **যুগে যুগে**—বিভিন্ন যুগে।

### অনুবাদ

**পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।**

## তাৎপর্য

এই বিশেষ শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য অবতারদের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। তাঁকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হয়, কেন না তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর চিন্ময় ধাম থেকে এই জগতে অবতরণ করেন। ভগবানের সমস্ত অবতার, এমন কি ভগবান নিজেও এই জড় জগতের বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্নরূপে অবতরণ করেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য। কখনো তিনি স্বয়ং অবতরণ করেন, আবার কখনো বা বিভিন্ন অংশ অথবা অংশের অংশ বা কলা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট শক্ত্যাবেশ অবতার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য এই জগতে অবতরণ করেন। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ—তাঁর মধ্যে সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত বীর্য, সমস্ত যশ, সমস্ত শ্রী, সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত বৈরাগ্য রয়েছে। সেগুলি যখন আংশিকভাবে তাঁর অংশ অথবা কলার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে,তাঁর বিভিন্ন শক্তির এই প্রকাশ কোনও বিশেষ কর্ম সম্পাদন করার জন্য। ঘরে একটি ছোট বৈদ্যুতিক্ বাতি জ্বালাতে গেলে আমাদের মনে হওয়া উচিত নয় যে,'ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস' এই ছোট বাতিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই পাওয়ার হাউসটি আরও অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়নামো' চালাতে পারে। তেমনই, ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা সীমিত শক্তি প্রদর্শন করেন, কেন না সেই বিশেষ সময়ে ঠিক ততটুকু শক্তিই প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পরশুরাম এবং নৃসিংহদেব যথাক্রমে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে এবং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে সংহার করে অস্বাভাকি ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু এত শক্তিশালী ছিল যে, তার ভ্রুকুটিতে স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত ভয়ে কম্পিত হত। জড় জগতের অনেক উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত দেবতাদের আয়ু, শ্রী, ঐশ্বর্য এবং অন্য সমস্ত সম্পদ মানুষদের থেকে অনেক অনেক গুণে বেশি। কিন্তু তাঁরাও হিরণ্যকশিপুর ভয়ে ভীত ছিলেন। এইভাবে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে,হিরণ্যকশিপু কত শক্তিশালী ছিল। কিন্তু ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর নখের দ্বারা সেই হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদীর্ণ করে তাকে সংহার করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে,জড় জগতে যে-কোনও মানুষ যত শক্তিশালীই হোক না কেন, ভগবানের নখের শক্তির কাছে তার শক্তি নিতান্তই নগণ্য। তেমনই, যে সমস্ত অবাধ্য রাজারা তাদের স্ব-স্ব রাজ্যে প্রভূত শক্তি সহকারে বিরাজ করছিল, তাদের সংহার করে জামদগ্ন্য ভগবানের শক্তি প্রদর্শন করে গেছেন। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার নারদ ও অংশ অবতার বরাহ এবং পরোক্ষভাবে শক্ত্যাবিষ্ট অবতার বুদ্ধ জনসাধারণের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র এবং ধন্বন্তরি তাঁর যশ প্রকাশ করেছেন; আর বলরাম, মোহিনী এবং বামন তাঁর সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন। দত্তাত্রেয়, মৎস্য, কুমার

এবং কপিল তাঁর অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদর্শন করেছেন। নর এবং নারায়ণ ঋষি তাঁর বৈরাগ্য প্রদর্শন করেছেন। এইভাবে ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ রূপ প্রদর্শন করেন। এইভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। আর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সব চাইতে অদ্ভুত লীলা হচ্ছে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস। ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ যদিও আপাতদৃষ্টিতে কাম বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সৎ, এবং আনন্দময়। ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর যে লীলাবিলাস, তা কখনও ভুল বুঝা উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে এই সমস্ত অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় একে একে প্রথম ন'টি স্কন্ধের তত্ত্ব উপলব্ধি করার পর।

শ্রীল জীব গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে, মহাজনদের মতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। এমন নয় যে, শ্রীকৃষ্ণের কোন অবতারী রয়েছে। পরমতত্ত্বের লক্ষণগুলি পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণে রয়েছে, এবং *ভগবদ্গীতায়* ভগবান নিজেই ঘোষণা করে গেছেন যে, তাঁর থেকে বড় অথবা তাঁর সমান আর কোনও সত্য নেই। এই শ্লোকে 'স্বয়ম্' কথাটির বিশেষ উল্লেখের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কোনও অবতারী নেই। যদিও অন্যান্য অবতারদেরও ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁদের পরমেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়নি। এই শ্লোকে 'স্বয়ম্' শব্দটির মাধ্যমে পরম মঙ্গলময়ের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়েছে।

পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ং-রূপ, স্বয়ং-প্রকাশ, তদেকাত্মা, প্রাভব, বিলাস, অবতার, আবেশ এবং জীবরূপে বিভিন্ন অংশ ও কলায় নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁদের সকলেই তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। অপ্রাকৃত জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টিটি গুণ বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবানের সমস্ত অংশ এবং কলা অবতারদের মধ্যে তাঁর এই সমস্ত গুণ আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে এই সমস্ত গুণসম্পন্ন। আর স্বয়ং-প্রকাশ, তদেকাত্মা থেকে শুরু করে অবতার পর্যন্ত সকলেই হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁদের মধ্যে শতকরা তিরানব্বই ভাগ পর্যন্ত এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণগুলির প্রকাশ হতে দেখা যায়। দেবাদিদেব মহাদেব, যিনি অবতার নন আবার আবেশও নন, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যবর্তী, তাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণের শতকরা প্রায় চুরাশি ভাগ রয়েছে। কিন্তু জীবেরা কেবল শতকরা আটাত্তর ভাগ পর্যন্ত এই সমস্ত গুণের অধিকারী হতে পারে। বদ্ধ অবস্থায় জীবেদের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী অতি অল্প মাত্রায় প্রকাশিত হয়, এবং তা নির্ভর করে তার পুণ্যফলের উপর। সর্বোত্তম জীব হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ব্রহ্মা। তাঁর

মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী শতকরা আটাত্তর ভাগ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। আর মানুষের মধ্যে তা খুবই অল্প পরিমাণে প্রকাশিত হয়। মানব জীবনের পূর্ণতা হচ্ছে এই সমস্ত গুণাবলীর আটাত্তর ভাগ পূর্ণরূপে প্রকাশ করা। জীব কখনই শিব, বিষ্ণু, অথবা শ্রীকৃষ্ণের মতো গুণসম্পন্ন হতে পারে না। পূর্ণরূপে শতকরা আটাত্তর ভাগ গুণ প্রকাশ করে জীব দেবত্ব প্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু সে কখনই শিব, বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণের মতো ভগবত্তা লাভ করতে পারে না। যথা সময়ে সে ব্রহ্মা হতে পারে। দেবতারা হচ্ছেন হরিধাম এবং মহেশধাম আদি চিৎ জগতের বিভিন্ন লোকে ভগবানের নিত্য পার্ষদ। চিন্ময় লোক বা বৈকুণ্ঠধামের ঊর্ধ্বে হচ্ছে কৃষ্ণলোক বা গোলোক-বৃন্দাবন, এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীবেরা এই সমস্ত গুণের শতকরা আটাত্তর ভাগ পূর্ণরূপে লাভ করে এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর কৃষ্ণলোকে প্রবেশ করতে পারেন।

## শ্লোক ২৯

**জন্ম গুহ্যং ভগবতো য এতৎপ্রয়তো নরঃ।**
**সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥**

**জন্ম**—জন্ম ; **গুহ্যম্**—রহস্যজনক ; **ভগবতঃ**—ভগবানের ; **যঃ**—যে ; **এতৎ**—এই সমস্ত ; **প্রয়তঃ**—সাবধানতাপূর্বক ; **নরঃ**—মানুষ ; **সায়ম্**—সন্ধ্যা ; **প্রাতঃ**—সকাল ; **গৃণন্**—আবৃত্তি করেন ; **ভক্ত্যা**—ভক্তিপূর্বক ; **দুঃখ-গ্রামাৎ**—সব রকমের দুঃখ থেকে ; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

## অনুবাদ

**যে মানুষ মনোযোগ সহকারে ভগবানের রহস্যপূর্ণ প্রকট অর্থাৎ অবতরণের কথা সকাল এবং সন্ধ্যায় ভক্তিপূর্বক পাঠ করেন, তিনি জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হন।**

## তাৎপর্য

*ভগবদ্গীতায়* ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, কেউ যদি তত্ত্বগতভাবে ভগবানের জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে অবগত হয়, তা হলে সে দেহত্যাগের পর এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। তাই কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের রহস্যাবৃত অবতরণের কথা তত্ত্বতঃ জানতে পারলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবান যে তাঁর জন্ম এবং কর্ম এই জগতে প্রকাশ করেন তা সাধারণ নয়। তা রহস্যজনক, এবং যাঁরা ভক্তি সহকারে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তার গভীরে প্রবেশ করেন, তাঁদের কাছেই কেবল এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। এইভাবে জীব জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। সেই জন্যই ভগবানের আবির্ভাব এবং বিভিন্ন অবতরণের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং কেউ

যদি কেবল ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তা পাঠ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের দিব্য জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেন। এখানে 'বিমুক্ত' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে,ভগবানের জন্ম এবং কর্ম দিব্য ; তা না হলে কেবল তা পাঠ করার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হত না। তাই তা রহস্যাবৃত, এবং যারা ভগবদ্ভক্তির বিধিগুলি অনুসরণ করে না, তাঁরা জন্ম এবং কর্মের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

## শ্লোক ৩০

**এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ ।**
**মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি ॥ ৩০ ॥**

**এতৎ**—এই সমস্ত ; **রূপম্**—রূপ ; **ভগবতঃ**—ভগবানের ; **হি**—অবশ্যই ; **অরূপস্য**—যাঁর কোন জড় রূপ নেই ; **চিৎ-আত্মনঃ**—চিন্ময় জগতের ; **মায়া**—জড়া প্রকৃতি ; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা ; **বিরচিতম্**—নির্মিত ; **মহৎ-আদিভিঃ**—মহত্তত্ত্ব আদি জড় উপাদানের দ্বারা ; **আত্মনি**—আত্মার।

## অনুবাদ

**জড় জগতে ভগবানের যে বিরাট রূপের ধারণা, তা কল্পনাপ্রসূত। তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের (এবং নব্য ভক্তদের) ভগবানের রূপ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন প্রাকৃত বা জড় রূপ নেই।**

## তাৎপর্য

ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে ভগবানের বিশ্বরূপ বা বিরাট-রূপের উল্লেখ করা হয়নি, কেন না পূর্বোল্লিখিত ভগবানের সব কটি অবতারই হচ্ছেন অপ্রাকৃত। চিন্ময় রূপে জড়ের কোন সংস্রব নেই। বদ্ধ জীবের মতো তাঁর দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তদের জন্যই বিরাট-রূপের কল্পনা করা হয়েছে। তাদের জন্যই বিরাট-রূপের উপস্থাপনা করা হয়েছে, এবং তা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত বর্ণনা কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তদের জন্য। কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তরা জড়াতীত কোন কিছুর ধারণা করতে পারে না। ভগবানের রূপের প্রাকৃত ধারণা তাঁর বাস্তবিক স্বরূপের মধ্যে গণনা করা হয়নি। পরমাত্মা বা অন্তর্যামীরূপে ভগবান প্রতিটি প্রাকৃত রূপেই রয়েছেন, এমন কি তিনি পরমাণুর মধ্যেও রয়েছেন ; কিন্তু তাঁর বাহ্যিক প্রাকৃত (জড়) রূপ ভগবান এবং জীব উভয়েরই কাছে কাল্পনিক। বদ্ধ জীবের বর্তমান রূপও বাস্তব নয়। অর্থাৎ, এখানে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, ভগবানের বিরাট রূপ সম্বন্ধে যে জড় ধারণা রয়েছে, তা কাল্পনিক। ভগবান এবং জীব উভয়েই হচ্ছেন চেতন বস্তু এবং তাঁদের স্বরূপে তাঁরা হচ্ছেন চিন্ময়।

## শ্লোক ৩১

**যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।**
**এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩১ ॥**

**যথা**—যথাযথ; **নভসি**—আকাশে; **মেঘৌঘঃ**—মেঘসমূহ; **রেণুঃ**—ধূলকণা; **বা**—এবং; **পার্থিবঃ**—পার্থিব; **অনিলে**—বায়ুতে; **এবম্**—সেইভাবে; **দ্রষ্টরি**—দ্রষ্টাকে; **দৃশ্যত্বম্**—দর্শন করার জন্য; **আরোপিতম্**—আরোপিত; **অবুদ্ধিভিঃ**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা।

## অনুবাদ

**মেঘ এবং ধূলিকণা বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বলে যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বায়ু ধুলাচ্ছন্ন। তেমনই, তারা আত্মায় জড় শরীরের ধারণা আরোপ করে।**

## তাৎপর্য

এখানে পুনরায় প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, আমাদের জড় চক্ষু এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা অধোক্ষজ ভগবানকে দর্শন করতে পারি না। এমন কি আমরা জীবের জড় দেহে যে চিৎ স্ফুলিঙ্গ রয়েছে তারও সন্ধান জানি না। আমরা জীবের স্থূল জড় দেহ অথবা সূক্ষ্ম মনকে দর্শন করতে পারি, কিন্তু আমরা দেহের অভ্যন্তরে স্থিত চিৎ স্ফুলিঙ্গটি দর্শন করতে পারি না। তাই জড় দেহের উপস্থিতির মাধ্যমেই আমরা জীবের উপস্থিতি স্বীকার করি। তেমনই, যারা তাদের বর্তমান জড় চক্ষু অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে দর্শন করতে চান, তাঁদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিরাট-রূপ নামক ভগবানের বাহ্যিক রূপের ধ্যান করতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন ভদ্রলোক যখন তাঁর গাড়ি চালিয়ে যান, তখন আমরা দৃশ্যমান গাড়িটির দ্বারা গাড়িতে বসে থাকা সেই মানুষটির পরিচয় দিয়ে থাকি। রাষ্ট্রপতি যখন তাঁর বিশেষ গাড়িতে করে যান, তখন আমরা বলি, "রাষ্ট্রপতি যাচ্ছেন।" সাময়িকভাবে আমরা গাড়িটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পরিচয় দিয়ে থাকি। তেমনই যে-সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করার আগেই ভগবানকে দেখতে চায়, তাদের বিশাল রূপের মাধ্যমে ভগবানের বিরাট-রূপ দেখানো হয়, যদিও ভগবান বাহিরে এবং অভ্যন্তরে উভয় স্তরেই রয়েছেন। আকাশের নীলিমা সেই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। যদিও আকাশ এবং আকাশের নীলিমা ভিন্ন, তবু আমরা মনে করি যে, আকাশের রঙ নীল। কিন্তু সেটি অল্পজ্ঞ মানুষদের ধারণা মাত্র।

## শ্লোক ৩২

**অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্।**
**অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎস জীবো যৎপুনর্ভবঃ ॥ ৩২ ॥**

**অতঃ**—এই ; **পরম্**—ঊর্ধ্বে ; **যৎ**—যা ; **অব্যক্তম্**—অপ্রকাশিত ; **অব্যূঢ়**— পরিণত রূপবিহীন ; **গুণবৃংহিতম্**—গুণের দ্বারা প্রভাবিত ; **অদৃষ্ট**—যা দেখা যায় না ; **অশ্রুত**—যা শোনা যায় না ; **বস্তুত্বাৎ**—সেই রকম হয়ে ; **সঃ**—তা ; **জীবঃ**—জীব ; **যৎ**—যা ; **পুনর্ভবঃ**—পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

## অনুবাদ

**এই স্থূল রূপের ধারণার ঊর্ধ্বে আরেকটি সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে, যার কোন পরিণত রূপ নেই এবং যা দেখা যায় না, যাকে শোনা যায় না এবং যা অপ্রকাশিত। এই সূক্ষ্ম স্তরের ঊর্ধ্বে হচ্ছে জীবের স্বরূপ, তা না হলে সে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে পারত না।**

## তাৎপর্য

স্থূল জগতকে যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট শরীর বলে অনুমান করা হয়, তেমনই তাঁর সূক্ষ্ম রূপের ধারণা রয়েছে, যা দেখা বা শোনা না গেলেও অথবা প্রকাশিত না হলেও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই সমস্ত সূক্ষ্ম অথবা স্থূল শরীরের ধারণা জীব-চেতনার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে সম্পর্কিত ; স্থূল জড় রূপ এবং সূক্ষ্ম মানসিক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে জীবের স্বরূপ রয়েছে। জীব যখন তার জড় শরীরটি ত্যাগ করে, তখন তার স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্ম মনের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা বলি, জীব দেহত্যাগ করে চলে গেছে, কেন না তাকে আর কিছু করতে দেখা যায় না এবং তার কাছ থেকে কিছু শোনাও যায় না। গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকার সময় স্থূল শরীর যদিও কোন ক্রিয়া করে না, তবুও তাকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, সে শরীরের ভিতরে রয়েছে। সুতরাং, জীব দেহত্যাগ করে চলে গেলেও তার অর্থ এই নয় যে,তার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। তা অবশ্যই থাকে, তা না হলে বারবার কিভাবে তার জন্ম হয় ?

এর থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ভগবান চিন্ময় রূপে নিত্য বিরাজমান। তাঁর সেই রূপ জীবের মতো স্থূল বা সূক্ষ্ম নয় ; জীবের স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপের সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে না। ভগবানের রূপ সম্পর্কে সেই সমস্ত ধারণা কাল্পনিক। জীবের নিত্য চিন্ময় রূপ রয়েছে, যা কেবল জড় জগতের কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

## শ্লোক ৩৩

**যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।**
**অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥**

**যত্র**—যখন; **ইমে**—এই সব কিছুতে; **সৎ-অসৎ**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম; **রূপে**—রূপে; **প্রতিষিদ্ধে**—নিবারিত হওয়ায়; **স্ব-সংবিদা**—স্বরূপ-উপলব্ধির দ্বারা; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের দ্বারা; **আত্মনি**—আত্মাতে; **কৃতে**—আরোপিত হওয়ায়; **ইতি**—এইভাবে; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম-দর্শনম্**—পরম ব্রহ্মকে দর্শন করার পন্থা।

## অনুবাদ

**আত্মোপলব্ধির দ্বারা কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার কোন সম্পর্ক নেই, তখন সে নিজেকে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে।**

## তাৎপর্য

আত্মোপলব্ধি এবং জড় ভ্রমের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আত্মার বাহ্য আবরণরূপ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে জড়া প্রকৃতি কৃত অনিত্য এবং ভ্রমাত্মক বলে জানা। এই আবরণের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। পরমেশ্বর ভগবান কখনও এই জাতীয় আবরণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেটি স্থির নিশ্চিতরূপে জানার নামই হচ্ছে মুক্তি, অথবা ভগবৎ-দর্শন। অর্থাৎ, দিব্য বা পারমার্থিক জীবন-যাপন করার ফলেই কেবল আত্মোপলব্ধি সম্ভব। আত্মোপলব্ধি মানে হচ্ছে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রয়োজনগুলির প্রতি উদাসীন হওয়া এবং আত্মার কার্যকলাপে নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া। কোন কিছু করার অনুপ্রেরণা আসে আত্মা থেকে, কিন্তু সমস্ত কার্যকলাপ ভ্রমাত্মক হয়ে পড়ে আত্মার যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে। অজ্ঞানের ফলে জীব স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মার মঙ্গল সাধনের হিসাব-নিকাশ করে, এবং তার ফলে জন্ম-জন্মান্তরে তার সমস্ত কার্যকলাপ বিফল হয়। কিন্তু যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে কেউ যখন আত্মাকে জানতে পারে, তখনই আত্মার কার্যকলাপ শুরু হয়। তাই যে মানুষ আত্মার কার্যকলাপে যুক্ত, তাঁকে বলা হয় জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে বদ্ধ অবস্থায় থাকলেও তিনি মুক্ত।

আত্মোপলব্ধির এই পূর্ণ স্তর কখনও কৃত্রিম সাধনের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, তা লাভ হয় পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং সমস্ত জ্ঞান, স্মৃতি, অথবা বিস্মৃতি তাঁর থেকেই আসে। জীব যখন জড় জগতকে ভোগ করার ভ্রান্ত প্রয়াস করে, তখন ভগবান জীবকে বিস্মৃতির আবরণে আচ্ছাদিত করেন, এবং জীব

তখন তার স্থূল দেহকে এবং সূক্ষ্ম মনকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান অনুশীলন করার ফলে জীব যখন বিস্মৃতির কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, ভগবান তখন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেই জীবের মায়া-যবনিকা উত্তোলন করেন এবং তার ফলে সে নিজেকে চিনতে পারে। সে তখন তার নিত্য স্বরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় এবং বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। এই সমস্ত কার্য ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা অথবা সরাসরিভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্পাদন করেন।

## শ্লোক ৩৪

**যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।**
**সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ৩৪ ॥**

**যদি**—যদি; **এষা**—তারা; **উপরতা**—প্রশমিত হওয়া; **দেবী মায়া**—মায়াশক্তি; **বৈশারদী**—জ্ঞানসম্পন্ন; **মতিঃ**—আলোকপ্রাপ্তি; **সম্পন্নঃ**—সমৃদ্ধ; **এব**—অবশ্যই; **ইতি**—এইভাবে; **বিদুঃ**—অবগত হয়ে; **মহিম্নি**—মহিমায়; **স্বে**—আত্মার; **মহীয়তে**—প্রতিষ্ঠিত হয়ে।

## অনুবাদ

**ভগবানের কৃপায় যখন মায়াশক্তির প্রভাব প্রশমিত হয় এবং জীব পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হন এবং স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত হন।**

## তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর নাম, রূপ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি—সবই তাঁর থেকে অভিন্ন। তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে তাঁর অপ্রাকৃত শক্তি কার্যকরী হয়। তাঁর সেই শক্তি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তিরূপে কার্যকরী হয়, এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে তিনি পূর্বোক্ত যে কোন শক্তির মাধ্যমে যে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারেন। তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে বহিরঙ্গা শক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। তাই বদ্ধ জীব যখন বন্ধন-মুক্তির জন্য আকুল হয়ে প্রার্থনা করে এবং তপশ্চর্যা করে, তখন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, যা বদ্ধ জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, তাঁর কৃপার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়। তখন সেই শক্তিই সেই শরণাগত জীবকে পরমার্থ লাভের পথে উন্নতি সাধন করতে সহায়তা করে। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ-শক্তির দৃষ্টান্তটি খুবই যথাযথ। সুদক্ষ মিস্ত্রি বিদ্যুৎ-শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে তাপ উৎপাদন করতে পারে, আবার শীতলতাও উৎপাদন করতে পারে। তেমনই, যে বহিরঙ্গা শক্তি জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত করছে, তা ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে অন্তরঙ্গা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জীবকে নিত্য জীবন

লাভের পথে পরিচালিত করতে পারে। জীব যখন এইভাবে ভগবানের কৃপাপাত্র হয়, তখন সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে নিত্য চিন্ময় জীবন লাভ করে।

## শ্লোক ৩৫

**এবং জন্মানি কর্মাণি হ্যকর্তুরজনস্য চ।**
**বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ ॥ ৩৫ ॥**

## শব্দার্থ

**এবম্**—এইভাবে; **জন্মানি**—জন্ম; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **হি**—অবশ্যই; **অকর্তুঃ**—নিষ্ক্রিয়ের; **অজনস্য**—জন্মহীনের; **চ**—এবং; **বর্ণয়ন্তি**—বর্ণনা করে; **স্ম**—অতীতে; **কবয়ঃ**—বিদ্বান; **বেদ-গুহ্যানি**—বেদেও যা অজ্ঞেয়; **হৃৎ-পতেঃ**—হৃদয়েশ্বরের।

## অনুবাদ

**এইভাবে বিদ্বানেরা সেই জন্মরহিত এবং প্রাকৃত কর্মরহিত ভগবানের জন্ম এবং কর্মের বর্ণনা করেন, যা বৈদিক শাস্ত্রেও অনাবিষ্কৃত। তিনিই হচ্ছেন হৃদয়েশ্বর।**

## তাৎপর্য

জীব এবং ভগবান উভয়েই চিন্ময়। তাই তাঁরা উভয়েই নিত্য, এবং তাঁদের কারোরই জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। তবে পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে, ভগবানের তথাকথিত জন্ম বা আবির্ভাব এবং তিরোভাব জীবের জন্ম-মৃত্যুর মতো নয়। যে সমস্ত জীব জন্মগ্রহণ করে এবং তারপর আবার মৃত্যুবরণ করে, তারা জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা বদ্ধ। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য আবির্ভাব এবং তিরোভাব জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয়, তা হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য। তাঁর সেই কার্যকলাপের মহিমা মহান্ ঋষিরা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কীর্তন করে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, এই জড় জগতে তাঁর তথাকথিত জন্ম এবং কর্ম সবই দিব্য, এবং তাঁর সেই কার্যকলাপ ধ্যান করার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এবং জীব তখন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। শ্রুতিতেও বলা হয়েছে যে, অজন্মা যেন জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের করণীয় কিছুই নেই, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে তাঁর দ্বারাই সম্পাদিত হয়, যেন আপনা থেকেই সেগুলি হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব এবং তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ সবই অত্যন্ত গোপনীয়, এমন কি বৈদিক শাস্ত্রেও সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু তবুও বদ্ধজীবের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান সেই সব লীলাবিলাস করেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনার

যথার্থ সদ্ব্যবহার করা, যা হচ্ছে সবচাইতে সহজ এবং সুন্দরভাবে ব্রহ্মের ধ্যান করার পন্থা।

## শ্লোক ৩৬

**স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্ ।**
**ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ ষাড়্বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্গুণেশঃ ॥ ৩৬ ॥**

**সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **বা**—পর্যায়ক্রমে; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—প্রকাশিত জগৎ; **অমোঘ-লীলঃ**—যাঁর কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ; **সৃজতি**—সৃজন করেন; **অবতি অত্তি**—পালন করেন এবং ধ্বংস করেন; **ন**—না; **সজ্জতে**—প্রভাবিত হয়; **অস্মিন্**—তাদের মধ্যে; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **চ**—ও; **অন্তর্হিতঃ**—অন্তরে বিরাজমান; **আত্মতন্ত্রঃ**—আত্মনির্ভর; **ষাট্-বর্গিকম্**—ষড় ঐশ্বর্যসম্পন্ন; **জিঘ্রতি**—ঘ্রাণ গ্রহণ করার মতো আপাত আসক্তি; **ষট্-গুণেশঃ**—ছ'টি ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর।

### অনুবাদ

**যাঁর চরিত্র সর্বদাই নির্মল এবং নিষ্কলঙ্ক, সেই ভগবান ষড় ইন্দ্রিয়ের এবং ষড় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কোনভাবে প্রভাবিত না হয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজ করেন এবং তিনি সর্ব অবস্থাতেই সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।**

### তাৎপর্য

জীব এবং ভগবানের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে যে, ভগবান হচ্ছেন স্রষ্টা এবং জীব হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি। এখানে তাঁকে 'অমোঘলীলঃ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিতে কোন কিছুই দুঃখদায়ক নয়। যারা তাঁর সৃষ্টিতে বিঘ্ন উৎপাদন করে তারাই কেবল দুঃখ ভোগ করে। তিনি সব রকম জড় দুঃখ-দুর্দশার অতীত কেন না তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যসম্পন্ন, এবং তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। ত্রিতাপ দুঃখে জর্জরিত বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করার জন্য তিনি এই জড় জগৎ প্রকাশ করেন, তা পালন করেন এবং অবশেষে তা ধ্বংস করেন। তার এই ধরনের কার্যকলাপে তিনি কখনই কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হন না। এই জড় সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত অগভীর, ঠিক যেমন সুগন্ধী বস্তুর সংস্পর্শে না এসেই আমরা তার ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারি, অনেকটা সেই রকম। তাই সব রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অ-ভগবত্তত্ত্ব কখনো তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পারে না।

## শ্লোক ৩৭

**ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।**
**নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সন্তন্বতো নটচর্যামিবাজ্ঞঃ ॥ ৩৭ ॥**

**ন**—না; **চ**—এবং; **অস্য**—তাঁর; **কশ্চিৎ**—কেউ; **নিপুণেন**—দক্ষতা সহকারে; **ধাতুঃ**—সৃষ্টিকর্তার; **অবৈতি**—জানতে পারে; **জন্তুঃ**—জীব; **কুমনীষঃ**—অতি অল্প জ্ঞানসম্পন্ন; **ঊতীঃ**—ভগবানের কার্যকলাপ; **নামানি**—তাঁর নামসমূহ; **রূপাণি**—তাঁর রূপসমূহ; **মনঃ-বচোভিঃ**—মনের জল্পনা-কল্পনা অথবা বাক্যের দ্বারা; **সন্তন্বতঃ**—প্রদর্শন করে; **নটচর্যাম্**—নাটকীয় কার্য; **ইব**—মতো; **অজ্ঞ**—মূর্খ।

## অনুবাদ

**নটবৎ অভিনয়পরায়ণ পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ এবং লীলাবিলাসের অপ্রাকৃত স্বভাব বিকৃত মনোভাবাপন্ন মূর্খ মানুষেরা জানতে পারে না। তারা তাদের জল্পনা-কল্পনায় অথবা বাক্যের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করতে পারে না।**

## তাৎপর্য

পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতির বর্ণনা কেউই যথাযথভাবে করতে পারে না। তাই তাঁকে বলা হয় 'অবাঙ্মনসগোচর'। কিন্তু তবুও বিকৃত মনোভাবাপন্ন অল্পজ্ঞ কিছু মানুষ রয়েছে, যারা তাদের অপূর্ণ মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা এবং তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত বর্ণনার দ্বারা তাঁকে জানতে চায়। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর কার্যকলাপ, তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব, তাঁর নাম, তাঁর রূপ, তাঁর পরিকর, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত সব কিছুই রহস্যজনক বলে মনে হয়। দু'রকমের জড়বাদী রয়েছে; যথা—সকাম কর্মী এবং জ্ঞানী দার্শনিক। সকাম কর্মীদের পরম সত্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, আর মনোধর্মী জ্ঞানীরা সকাম কর্মে ব্যর্থ হয়ে তাদের মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে জানবার চেষ্টা করে। এই উভয় শ্রেণীর লোকের কাছেই পরমতত্ত্ব রহস্যাবৃত, ঠিক যেমন একটি শিশুর কাছে যাদুকরের ভেল্‌কিবাজি রহস্যাবৃত। অভক্তরা সকাম কর্মে এবং জল্পনা-কল্পনায় যতই পারদর্শী হোক না কেন, পরমেশ্বর ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তারা সর্বদাই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাদের সীমিত জ্ঞান নিয়ে তারা অপ্রাকৃত জগতের রহস্যাবৃত প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে না। মনোধর্মী জ্ঞানীরা অবশ্য স্থূল জড়বাদী বা সকাম কর্মীদের থেকে একটু উন্নত, কিন্তু যেহেতু তারা মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, সেহেতু তারা মনে করে যে, যারই রূপ আছে, নাম আছে এবং কার্যকলাপ রয়েছে, তা নিশ্চয়ই জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবান নিরাকার, নামহীন এবং কর্মহীন। আর যেহেতু এই ধরনের

মনোধর্মীরা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম এবং রূপকে জড় নাম এবং রূপের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, তাই তারা এক-একটি মহামূর্খ ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের সেই স্বল্প জ্ঞানের দ্বারা তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ প্রকৃতিতে প্রবেশ করতে পারে না। *ভগবদগীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর দিব্য প্রকৃতিতে বিরাজ করেন, এমন কি যখন তিনি এই জগতে অবতরণ করেন, তখনও তিনি তাঁর দিব্য প্রকৃতিতেই অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীর আর পাঁচ জন মহৎ মানুষের মতো, এবং এইভাবে তারা ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।

## শ্লোক ৩৮

**স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।**
**যোঽমায়য়া সংততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্ ॥ ৩৮ ॥**

**সঃ**—কেবল তিনি ; **বেদ**—জানতে পারেন ; **ধাতুঃ**—সৃষ্টিকর্তার ; **পদবীম্**— মহিমা ; **পরস্য**—পরা-প্রকৃতির ; **দুরন্তবীর্যস্য**—পরম শক্তিমানের ; **রথ-অঙ্গ-পাণেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর হস্তে রথের চাকা ধারণ করেছিলেন ; **যঃ**—যিনি ; **অমায়য়া**—আসক্তিরহিত ; **সংততয়া**—অবাধগতি ; **অনুবৃত্ত্যা**—অনুকূলভাবে ; **ভজেত**—সেবা করেন ; **তৎ-পাদ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ; **সরোজ-গন্ধম্**—পদ্মফুলের সৌরভ।

### অনুবাদ

**যাঁরা দুরন্তবীর্য রথচক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অনুকূলভাবে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা সেবাপরায়ণ, তাঁরাই কেবল জগতের সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ মহিমা, শক্তি এবং দিব্য ভাব সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।**

### তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। কেন না তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সকাম কর্মের ফল এবং মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। শুদ্ধ ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁদের অনন্য ভক্তির বিনিময়ে কোন রকম ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব রকম আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের সৃষ্টিতে সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ভগবানের সেবা করছেন। ভগবানের এই আইন থেকে কেউই রেহাই পায় না। যারা ভগবানের মায়া-শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে পরোক্ষভাবে ভগবানের সেবা করছে, তাদের সেই সেবা প্রতিকূল-ভাবাপন্ন। কিন্তু যাঁরা ভগবানের প্রিয় প্রতিনিধির

আনুগত্যে সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের সেই সেবা অনুকূল ভাবযুক্ত। এই ধরনের অনুকূল সেবকেরা হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত, এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে তাঁরা রহস্যাবৃত ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু মনোধর্মীরা সর্বদাই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজেই বলেছেন যে, তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের এগিয়ে যেতে পথ প্রদর্শন করেন, কেন না তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে ভগবানের সেবায় যুক্ত। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার একমাত্র উপায়। সকাম কর্ম এবং মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা এখানে প্রবেশের যোগ্যতা নয়।

## শ্লোক ৩৯

**অথেহ ধন্যা ভগবন্ত ইত্থং যদ্বাসুদেবেঽখিললোকনাথে।**
**কুর্বন্তি সর্বাত্মকমাত্মভাবং ন যত্র ভূয়ঃ পরিবর্ত উগ্রঃ ॥ ৩৯ ॥**

**অথ**—এইভাবে ; **ইহ**—এই জগতে ; **ধন্যাঃ**—সার্থক ; **ভগবন্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ; **ইত্থম্**—এই রকম ; **যৎ**—যা ; **বাসুদেবে**—পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ; **অখিল**—সম্পূর্ণ ; **লোকনাথে**—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের প্রতি ; **কুর্বন্তি**—অনুপ্রাণিত করে ; **সর্বাত্মকম্**—পূর্ণমাত্রায় ; **আত্ম**—আত্মা ; **ভাবম্**—দিব্য আনন্দ ; **ন**—কখনই না ; **যত্র**—যেখানে ; **ভূয়ঃ**—পুনরায় ; **পরিবর্তঃ**—পুনরাবৃত্তি ; **উগ্রঃ**—ভয়ানক।

## অনুবাদ

**এই ধরনের প্রশ্ন করার মাধ্যমেই কেবল এই জগতে সফল হওয়া যায় এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। কেন না এই ধরনের প্রশ্ন জগৎপতি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম বিকশিত করে, এবং জন্ম-মৃত্যুর ভয়ানক আবর্ত থেকে জীবকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে।**

## তাৎপর্য

সূত গোস্বামী এখানে শৌনকাদি ঋষিদের প্রশ্নের প্রশংসা করেছেন, কেন না তা ছিল ভগবৎ-বিষয়ক প্রশ্ন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ভগবানের ভক্তরাই কেবল তাঁকে সন্তোষজনক মাত্রায় জানতে পারে, তা ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। তাই ভক্তরা পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অদ্বয় জ্ঞানের পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তাই যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে অবগত। তাই ভক্তদের সর্বতোভাবে সার্থক বলে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জন্ম-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর দুঃখ থেকে মুক্ত।

## শ্লোক ৪০

**ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।**
**উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ।**
**নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ৪০ ॥**

**ইদম্**—এই ; **ভাগবতম্**—পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের বর্ণনা সমন্বিত গ্রন্থ ; **নাম**—নামের ; **পুরাণম্**—পুরাণ ; **ব্রহ্ম-সম্মিতম্**—শ্রীকৃষ্ণের অবতার ; **উত্তম-শ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **চরিতম্**—কার্যকলাপ ; **চকার**—সংকলিত হয়েছে ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবানের অবতার ; **ঋষিঃ**—শ্রীল ব্যাসদেব ; **নিঃশ্রেয়সায়**—পরম মঙ্গলের জন্য ; **লোকস্য**—সমস্ত মানুষদের ; **ধন্যম্**—সম্পূর্ণরূপে সার্থক ; **স্বস্তি-অয়নম্**—পূর্ণ আনন্দময় ; **মহৎ**—পরিপূর্ণ।

### অনুবাদ

**এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তা সংকলন করেছেন ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গল সাধন করা, এবং এটি সর্বতোভাবে সার্থক, পূর্ণ আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ।**

### তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের এবং ইতিহাসের নির্মল এবং পূর্ণ বর্ণনা। তাতে পরমেশ্বর ভগবানের কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তাই তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। আমরা যেভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করি, ঠিক সেইভাবেই আমাদের *শ্রীমদ্ভাগবতের* পূজা করা উচিত। তা যত্ন সহকারে এবং ধৈর্য সহকারে পাঠ করার ফলে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের পরম আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, যদি তা গুরু-পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত সদ্‌গুরুর কাছ থেকে লাভ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সচিব শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী উপদেশ দিয়ে গেছেন, যাঁরা জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষী তাঁরা যেন অবশ্যই ব্যক্তি-ভাগবতের কাছে গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করেন। ব্যক্তি-ভাগবত হচ্ছেন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরু এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে উপযুক্ত ফল লাভের জন্য তাঁর কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে যে পারমার্থিক লাভ হয়, *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করেও সেই একই ফল লাভ করা যায়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত আশীর্বাদ বহন করে, যা তাঁর সান্নিধ্যে এলেই কেবল লাভ করা যায়।

## শ্লোক ৪১

**তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্ ।**
**সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৪১ ॥**

**তৎ**—তা ; **ইদম্**—এই ; **গ্রাহয়ামাস**—গ্রহণ করতে বাধ্য করানো হয় ; **সুতম্**— তাঁর পুত্রকে ; **আত্মবতাম্**—আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানীদের ; **বরম্**—সব চাইতে সম্মানিত ; **সর্ব**—সমস্ত ; **বেদ**—বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ ; **ইতিহাসানাম্**—সমস্ত ইতিহাসের ; **সারম্**—সার ; **সারম্**—সার ; **সমুদ্ধৃতম্**—উদ্ধৃত।

### অনুবাদ

**শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সারতত্ত্ব আহরণ করার পর সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের মুকুটমণিস্বরূপ তাঁর পুত্রকে তা দান করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

অল্পজ্ঞ মানুষেরা মনে করেন যে, পৃথিবীর ইতিহাস শুরু হয়েছে বুদ্ধদেবের সময় থেকে, অথবা খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ বছর থেকে এবং শাস্ত্রে তার পূর্বের যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি কেবল কাল্পনিক কাহিনী। সেটি তাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। পুরাণ ও মহাভারত আদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সমস্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি যথার্থই ইতিহাস ; সেগুলি কেবল এই পৃথিবীর ইতিহাস নয়, ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রেরও ইতিহাস। সেই সমস্ত অল্পজ্ঞ মানুষদের কাছে শাস্ত্রে বর্ণিত সেই সমস্ত অন্যান্য গ্রহের ইতিহাস অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু তারা জানে না যে, অন্যান্য গ্রহগুলি সর্বতোভাবে সমপর্যায়ভুক্ত নয়। তাই এই পৃথিবীর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য গ্রহের ঘটনার তারতম্য থাকতে পারে। বিভিন্ন লোকের পরিস্থিতি, সময় এবং অবস্থার কথা বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, পুরাণ আদি শাস্ত্রে বর্ণিত ঘটনাবলী কাল্পনিক নয় বা অবিশ্বাস্য নয়। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, এক মানুষের আহার অন্য মানুষের বিষ হতে পারে। তাই পুরাণের কাহিনী কাল্পনিক বলে অস্বীকার করা উচিত নয়। শ্রীল ব্যাসদেবের মতো মহর্ষিদের তাঁদের সাহিত্যে কতকগুলি কাল্পনিক কাহিনীর উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

*শ্রীমদ্ভাগবতে* বিভিন্ন লোকের ইতিহাস থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য বাছাই করে বর্ণিত হয়েছে। তাই সমস্ত মহাজনেরা তাকে মহাপুরাণ বলে স্বীকার করেছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেগুলি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভগবানের দিব্য লীলার সাথে যুক্ত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের শিরোমণি, এবং তিনি এই *শ্রীমদ্ভাগবতকে* যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানরূপে বিবেচনা করে তাঁর পিতা শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন একজন মহাজন, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিষয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান বলে বিচার করে তিনি প্রথমে তা তাঁর মহান পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে দান করেছিলেন। এই ভাগবতকে দুধের সার-স্বরূপ ননীর সাথে তুলনা করা হয়। বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে দুধের সমুদ্রের মতো। ননী বা মাখন হচ্ছে দুধের সব চাইতে উপাদেয় সারাতিসার। আর *শ্রীমদ্ভাগবতও* হচ্ছে তেমনই, কেন না তাতে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের অতি উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ প্রামাণিক সমস্ত লীলা বিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অবিশ্বাসী, নাস্তিক এবং পেশাদার পাঠকদের কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী গ্রহণ করলে কোন লাভ হয় না। এই *ভাগবত* দান করেছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, এবং তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য তা করেননি। ভাগবত পাঠের অছিলায় অর্থ উপাজন করে পরিবার প্রতিপালন করার প্রয়োজনীয়তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ছিল না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করা উচিত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আদর্শ প্রতিনিধির কাছ থেকে, যাঁকে অবশ্যই পরিবার প্রতিপালনের দায়মুক্ত সন্ন্যাসী হতে হবে। দুধ নিঃসন্দেহে অতি উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যকর, কিন্তু কোন সর্প যখন তা স্পর্শ করে তখন তা আর পুষ্টিকর আহারযোগ্য থাকে না; পক্ষান্তরে তা তখন ভয়ঙ্কর বিষে পরিণত হয়। তেমনই, যারা যথার্থ বৈষ্ণব-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নন, তারা যেন কখনই অর্থ উপার্জনের জন্য ভাগবত পাঠ করার ব্যবস্থা শুরু করে বহু শ্রোতার পারমার্থিক মৃত্যুর কারণ না হয়ে দাঁড়ান। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) জানা, আর *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সংকলিত জ্ঞানরূপে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই তা হচ্ছে বেদের সারাতিসার, এবং তাতে বিভিন্ন যুগে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমস্ত তথ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে সমস্ত ইতিহাসের সারাতিসার।

## শ্লোক ৪২

**স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্।**
**প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥**

**সঃ**—শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র; **তু**—পুনরায়; **সংশ্রাবয়ামাস**—শুনিয়েছিলেন; **মহারাজম্**—মহারাজকে; **পরীক্ষিতম্**—পরীক্ষিৎ নামক; **প্রায়-উপ-বিষ্টম্**—আমরণ অনশন; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **পরীতম্**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **পরম-ঋষিভিঃ**—মহান ঋষিদের দ্বারা।

### অনুবাদ

**ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী গঙ্গার তটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট এবং মহান ঋষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন।**

## তাৎপর্য

সমস্ত দিব্য-জ্ঞান গুরুপরম্পরায় গ্রহণ করতে হয়। গুরুপরম্পরার ধারায় গ্রহণ না করলে যথাযথভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* বা অন্যান্য বৈদিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। শ্রীল ব্যাসদেব এই জ্ঞান দান করেছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এবং শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে তা লাভ করেছিলেন শ্রীল সূত গোস্বামী। তাই সূত গোস্বামী অথবা তাঁর প্রতিনিধির কাছ থেকে এই *ভাগবতের* বাণী গ্রহণ করতে হয়। কতকগুলি অসঙ্গত ব্যাখ্যাকারীর কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করা উচিত নয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যথাসময়ে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর রাজ্য এবং পরিবার-পরিজন পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। সেই মহান্ সম্রাটের মৃত্যু আসন্ন জেনে সমস্ত মুনি-ঋষি-যোগী আদি সমস্ত মহাত্মারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। অন্তিম সময়ে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা তাঁকে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং অবশেষে তিনি স্থির করেছিলেন যে, তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করবেন। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শোনান।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য, যিনি মায়াবাদ-দর্শন প্রচার করেছিলেন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিও নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় গ্রহণ করা, কেন না তর্ক করে কোন কিছুই লাভ করা যাবে না। পরোক্ষভাবে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য স্বীকার করে গেছেন যে, তিনি যে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যারূপে পুষ্পিতা বাণী প্রচার করে গেছেন, তা মৃত্যুর সময় জীবকে রক্ষা করতে পারবে না। মৃত্যুর শোচনীয় অবস্থার সময় অবশ্যই গোবিন্দের নাম উচ্চারণ করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সমস্ত মহান্ পরমার্থবাদীদের উপদেশ। বহু পূর্বে শুকদেব গোস্বামীও সেই সত্যকেই প্রতিপন্ন করে গেছেন যে, অন্তিম সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করতে হবে। সমস্ত পারমার্থিক কার্যকলাপের সেইটি হচ্ছে সারাতিসার। এই নিত্য সত্যকে অনুসরণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন, এবং তা কীর্তন করেছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী। এই *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েরই উদ্ধারের মাধ্যম ছিল এক।

## শ্লোক ৪৩

**কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।**
**কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৪৩ ॥**

**কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্ব-ধাম**—স্বীয় ধাম; **উপগতে**—ফিরে গেলে; **ধর্ম**—ধর্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **আদিভিঃ**—যুক্ত; **সহ**—সহিত; **কলৌ**—কলিযুগে; **নষ্ট-দৃশাম্**—

দৃষ্টিহীন মানুষদের; **এষঃ**—এই সমস্ত; **পুরাণ-অর্কঃ**—সূর্যের মতো উজ্জ্বল পুরাণ; **অধুনা**—এখন; **উদিতঃ**—উদিত হয়েছে।

## অনুবাদ

**শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞান সহ নিজ ধামে গমন করলেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবৎ-দর্শনে অক্ষম মানুষেরা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।**

## তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম রয়েছে, সেখানে তিনি নিত্যকাল ধরে তাঁর নিত্য পার্ষদ এবং পরিকর সহ নিত্য আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর সেই নিত্য ধাম তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, কিন্তু এই জড় জগৎ হচ্ছে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তিনি যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সহ সমস্ত পরিকরদের নিয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন; তাকে বলা হয় আত্মমায়া। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তিনি তাঁর স্বীয় শক্তির (আত্মমায়া) দ্বারা প্রকট হন। তাই তাঁর রূপ, নাম, লীলা, পরিকর, ধাম ইত্যাদি জড় সৃষ্টি নয়। তিনি আসেন বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য। ধর্ম হচ্ছে ভগবানেরই প্রণীত আইন। ভগবান ছাড়া কেউই ধর্ম-তত্ত্ব স্থাপন করতে পারেন না। তিনি অথবা তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট উপযুক্ত প্রতিনিধিই কেবল ধর্মতত্ত্ব নির্দেশ করতে পারেন। প্রকৃত ধর্মের অর্থ হচ্ছে—ভগবানকে জানা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা জানা, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানা এবং এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর আমরা যে চরমে কোথায় যাব সে সম্বন্ধে জানা। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বদ্ধ জীবেরা এই মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না। তাদের অধিকাংশই পশুর মতো আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে মগ্ন। তারা ধর্ম, জ্ঞান অথবা মুক্তির অছিলায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। বিশেষ করে এই কলিযুগে তারা আরও বেশি অন্ধ হয়ে পড়েছে। এই কলিযুগের জনসাধারণ এক উন্নত স্তরের পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। পারমার্থিক জ্ঞান অথবা ধর্মপরায়ণ জীবনের প্রতি তাদের কোন রকম স্পৃহা নেই। তারা এতই অন্ধ যে, তারা তাদের মন, বুদ্ধি অথবা অহংকারের ঊর্ধ্বে আর কিছুই দেখতে পায় না, কিন্তু তবুও তারা জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং জাগতিক উন্নতির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। তাদের বর্তমান দেহ ত্যাগ করার পর তারা কুকুর অথবা শূকরের শরীর প্রাপ্ত হবে, কেন না মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে। কলিযুগ শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ঠিক কলিযুগ শুরু হওয়ার প্রারম্ভে তিনি তাঁর নিত্য ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন এখানে বর্তমান ছিলেন, তখন তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি সব কিছু প্রদর্শন করে

গেছেন। তিনি বিশেষ করে *ভগবদ্গীতার* বাণী দান করে গেছেন এবং ধর্মের নামে যে সমস্ত প্রবঞ্চনা সমাজে চলছিল, সে সব তিনি নির্মূল করেছিলেন। আর এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে তিনি শ্রীল নারদ মুনির মাধ্যমে শ্রীল ব্যাসদেবের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করার জন্য। এইভাবে *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে এই কলিযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষদের জন্য আলোকবাহী পথ-প্রদর্শকের মতো। অর্থাৎ, এই কলিযুগের মানুষ যদি জীবনের যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হয়ে চায়, তা হলে কেবল এই দুটি গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তা হলেই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রাথমিক পাঠ। আর *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে জীবনের সার-সর্বস্ব, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাই আমাদের অবশ্যই *শ্রীমদ্ভাগবতকে* শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করতে হবে। যিনি *শ্রীমদ্ভাগবতকে* দর্শন করতে পারেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকেও সাক্ষাৎ দর্শন করতে পারেন; কেন না *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন।

## শ্লোক ৪৪

**তত্র কীর্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ।**
**অহং চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ।**
**সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ॥ ৪৪ ॥**

**তত্র**—সেখানে; **কীর্তয়তঃ**—কীর্তন করার সময়; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **বিপ্রর্ষেঃ**—মহান্ ব্রহ্মর্ষি থেকে; **ভূরি**—মহৎ; **তেজসঃ**—শক্তিশালী; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **অধ্যগমম্**—বুঝতে পেরেছিলেন; **তত্র**—সেই সভায়; **নিবিষ্টঃ**—পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে; **তৎ-অনুগ্রহাৎ**—তাঁর কৃপার প্রভাবে; **সঃ**—সেই বিষয়; **অহম্**—আমি; **বঃ**—আপনাদের; **শ্রাবয়িষ্যামি**—শোনাব; **যথাধীতম্ যথামতি**—আমার উপলব্ধি অনুসারে।

### অনুবাদ

**হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, (মহারাজ পরীক্ষিতের সমক্ষে) শুকদেব গোস্বামী যখন শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, তখন নিবিষ্ট চিত্তে আমি তা শ্রবণ করেছিলাম, এবং তাই সেই মহান্ শক্তিশালী বিপ্রর্ষির কৃপায় আমি শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। এখন তাঁর কাছ থেকে আমি যা শুনেছিলাম, তা আমার উপলব্ধি অনুসারে আপনাদের শোনাতে চেষ্টা করব।**

### তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামীর মতো আত্মজ্ঞানী মহাত্মার কাছ থেকে কেউ যখন *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেন, তখন তাঁরা সেই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি

উপলব্ধি করতে পারেন। তথাকথিত যে সমস্ত ভাগবত-পাঠক অর্থ উপার্জন করার জন্য *ভাগবত* পাঠ করে এবং সেই অর্থ নিয়ে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়, সেই সমস্ত মূর্খের ভাগবত পাঠ শুনে *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যারা কামাসক্ত মানুষের সঙ্গ করে, তারা কখনও *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেটিই হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* উপলব্ধির রহস্য। যে সমস্ত মানুষ তাদের জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে ভাগবতের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, তাদের কাছ থেকেও *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ জানা যায় না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আদর্শ প্রতিনিধি ছাড়া আর কারও কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* শিক্ষা লাভ করা যায় না। কেউ যদি *শ্রীমদ্ভাগবতের* পৃষ্ঠায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চান, তা হলে তাঁকে এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। এটিই হচ্ছে যথার্থ পন্থা, এবং এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। শ্রীল সূত গোস্বামী হচ্ছেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আদর্শ প্রতিনিধি, কেন না সেই মহান্ ব্রহ্মর্ষির কাছ থেকে যেই জ্ঞান তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি যথাযথভাবে প্রদান করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতা শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে যেভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি তা প্রদান করেছিলেন, আর শ্রীল সূত গোস্বামীও প্রদান করেছিলেন ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তিনি তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন। কেবল শুনলেই হয় না, নিবিষ্ট চিত্তে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। 'নিবিষ্ট' কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, সূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* রসামৃত তাঁর কর্ণকুহরের মাধ্যমে পান করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* জ্ঞান লাভ করার প্রকৃত পন্থা। সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট চিত্তে এই জ্ঞান আহরণ করতে হয় এবং তা হলেই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতের* জ্ঞান আহরণ করার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। যার হৃদয় নির্মল নয়, পবিত্র নয়, সে কখনও নিবিষ্ট চিত্তে এই জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। যে মানুষের কার্যকলাপ পবিত্র নয়, তার মনও পবিত্র হতে পারে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, এবং মৈথুনাদির প্রভাবমুক্ত হয়ে যারা পবিত্র হয়নি, তাদের কার্যকলাপও পবিত্র হতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি নিবিষ্ট চিত্তে উপযুক্ত বক্তার শ্রীমুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে প্রথম থেকেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি পৃষ্ঠায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারবেন।

*ইতি—"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।*